ব্যাবিলন কথকতা

৯ম সংখ্যা
১৬ ডিসেম্বর ২০১৪

ব্যাবিলন গ্রুপ

TRENDZ™
www.trendzbd.com
www.facebook.com/Trendzbangladesh ▪ Care line 01716-592959

সম্পাদক:
এস এম এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক:
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি

বিশেষ সহযোগিতায়:
কাজী এ এম তুষার আলম
জেভিয়ার বিপ্লব দাস
আরিফ হোসেন

অলংকরণ:
তাওসীফ আল মিহ্‌রান

প্রচ্ছদ:
ফারহানা রহমান সুরভী

শিল্প নির্দেশনা:
স্বাধীন খান

সহযোগিতায়:
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ:
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৯৩৬১৫৬১০০

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী	আসাদ চৌধুরী	২
সম্পাদকীয়	এস এম এমদাদুল ইসলাম	৩-৪
ভোলা যাত্রার ইতিবৃত্ত	মোহাম্মদ হাসান	৫-৮
বৈশাখী হৃদয়	এ এইচ এম সামিউল বাশার রাজা	৮
আবার আসবেন কিন্তু	কাজী এ এম তুষার আলম	৯-১০
প্রার্থনা শূন্যতার কাছে	এস এম আরিফ রাজ্জাক	১১-১২
সচেতন	মোঃ মাহমুদ হাসান	১২
আগুন	মোঃ রবিউল ইসলাম	১২
আমার ছোট বোন, আমরা ও থ্যালাসেমিয়া	আয়শা সিদ্দিকা আরজু	১৩-১৫
মা	হুমায়ুন কবীর	১৫
স্বপ্নের ঘুম	মোঃ সফিকুল ইসলাম	১৫
স্বপ্নের দিনগুলি	সাঈদ আহমেদ	১৬
খোলপেটুয়া নদীতীরের মানুষগুলো	হাদিয়ার রহমান মীর	১৭
স্মৃতি	এ কে এম গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী	১৮-২৩
ভাবনার অন্তরালে	মাহাবুবুর রহমান	২৪-২৫
প্রাইস অফ মিটার	মোঃ শাহিনুর ইসলাম	২৫
বাংলা তুমি আমার ভূমি	জেসি খাতুন	২৫
যশোহর ও আমি	আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ	২৬-২৭
মনের কষ্ট রইলো মনে	আব্দুল কাদের	২৮
আমরা যে ড্রাইভার	মোঃ মামুন হোসেন	২৮
শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও এর বিভিন্ন দিক	উত্তম ভৌমিক	২৯
মুক্তিযুদ্ধের কথা-মুক্তিযোদ্ধার কথা	ডাঃ মোঃ মোজাহারুল হক	৩০-৩১
বাঙ্গালী আমি	মোঃ কবিরুল ইসলাম	৩২
বিদায় বন্ধু	সুমাইয়া আক্তার	৩২
ব্যাবিলন আমার জান, ব্যাবিলন আমার প্রাণ	ময়না	৩৩
স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	ইথার আক্তারুজ্জামান	৩৩
নীল বৃত্তে বন্দী	মেহেদী হাসান	৩৪-৩৫
প্রকৃতির পাগলামী	মৌমিতা	৩৬
সোনার বাংলাদেশ	মোহাম্মদ আবুল কালাম	৩৬
স্মৃতির অন্তরালে	মোঃ মমতাজুল হাসান খান মিল্টন	৩৭-৩৮
শুভেচ্ছা বাণী	শামসুল আলম	৩৮
হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি	মাহমুদ আলম সিদ্দিকি	৩৯-৪২
Let's Give It A Try	S M Emdadul Islam	৪৩-৪৫
Friends Are Forever	Sohely Suraiya Sadeque	৪৬-৪৭
Visiting the Dreamland, United States of America	Muhammad Saiful Hoque	৪৮-৫০
ফটো অ্যালবাম	ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি	৫১-৫২

হঠাৎ আলোর ঝলকানি

ব্যাবিলন গ্রুপ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা ছিল না, তবে ব্যাবিলন কথকতা নামক যে সংকলনটি বেরোয় তার কয়েকটি সংখ্যা পড়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। এর ফলে কিছুটা হলেও ধারণা করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, অনুষ্ঠানে গিয়ে আমার অবাক হবার পালা। মিলনায়তনটি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, অনুষ্ঠান চলছিল একেবারে পরিকল্পনা মতো, অকারণে আসা-যাওয়া নেই। কর্মকর্তা ও কর্মীবাহিনীর মধ্যে এমন সমঝোতা এবং বোঝাবুঝি আমি আমার জীবনে আর কোথাও দেখিনি। কোথাও কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা নেই, খবরদারি নেই- যেন সবাই জানেন তাদের কী কী করতে হবে। ভাষন, নিজের লেখা পাঠ যাঁরা করছিলেন তাঁরা সবাই এই গ্রুপেই কাজ করেন। ব্যাবিলন কথকতায় আগেই পড়েছিলাম এদের সম্পর্কের কথা, ভেবেছিলাম বাড়িয়ে লিখেছেন হয়তো, দেখে মনে হলো, না তো। জাপানের শিল্প-মালিকদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জেনেছিলাম যে, কর্মীরা ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে একেবারে নিজেদেরই মনে করেন। কোনো কর্মীর অসুবিধা হলে, তিনি জানেন ঐ সংস্থাই তাঁর পরিবারের দায়িত্ব নেবেন, ফলে কাজে আন্তরিকতার ঘাটতি পড়ে না কখনোই।

গিয়েছিলাম যখন বাংলাদেশের খুবই টালমাটাল অবস্থা। গার্মেন্টস সেক্টরে তখন বড় ধরনের তোলপাড় শুরু হয়েছে রানা প্লাজার ঘটনাকে ঘিরে। শুধু তাই নয়, ক্ষমতায় টিকে থাকা, আর ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার যে রাজনীতি চলছিল, সেখানে ও-রকম একটি পরিবেশে কিছুক্ষণ থেকে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছিলাম। সিকিওরিটির এতো কড়াকড়ি কেন? না, কর্মীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই এসব। বড়ো ভালো লেগেছিল ঐ ক'টি মুহূর্ত। দেশকে ভালোবাসার সাধ জাগিয়েছিল ব্যাবিলন গ্রুপ। শাবাস।

আসাদ চৌধুরী

০৩ নভেম্বর, ২০১৪

আসাদ চৌধুরী
কবি

সম্পাদকীয়

বরাবরের মতো এবারো মনে হলো যেন খুব দ্রুত ২০১৪ সালটা ফুরিয়ে গেলো। এমন ভাবার একটা বড় কারণ হয়তোবা এই যে, বছরটা দেশের পোশাক শিল্পের জন্য সার্বিকভাবে তেমন সুখকর হয়নি। রানা প্লাজা ও গত বছরের শেষের দিকে উদ্ভুত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বিদেশি ক্রেতাদের ভেতরে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে তা এখনো মিলিয়ে যায়নি মনে হয়। অনেকগুলো দিন-মাস পার হয়ে গেলেও শিল্পে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি এখন পর্যন্ত। রানা প্লাজা-উত্তর সচেতনতার ফসল অ্যাকর্ড এবং এ্যালায়েন্স (Accord and Alliance)- ক্রেতাদের স্বতন্ত্র জোট দু'টো অনেক বেশি সময় নিয়েছে কারখানার ভবন নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে এই শিল্পকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে। যার ফলে বিদেশি ক্রেতাদের নানানমুখী তালবাহানার শিকার হয়েছে বহু পোশাক শিল্প কারখানা। ২০১৩ সাল ভালো যায়নি - ভালো গেলোনা চলতি বছরটাও। ২০১৫ সাল এদেশের রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের জন্য গুছিয়ে নেয়ার ও ঘুরে দাঁড়াবার হোক - এই আশা করছি। আশা এই বিশ্বাস থেকে করছি যে, আমি মনে করি গত এক বছরের বেশি সময় ধরে এই শিল্পের মালিকেরা শিল্পের ইতিহাসের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশি দায়িত্বশীলতা ও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং অতীতের দুর্বলতা ও ভুল শুধরে তৈরী পোশাক শিল্পকে দৃঢ় পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে সবার সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। চারদিকে সুপরিবর্তনের ছাপ তাই খুবই স্পষ্ট। বরং বলা যায় ক্রেতা সাধারণের বেশিরভাগ এক্ষেত্রে যতোটা বাগাড়ম্বর করেছেন, ফলপ্রসূ কোন কাজে তার ধারেকাছেও থাকেননি তারা। বিশ্বের বড় বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে এই শিল্পে দুর্যোগ মুহূর্তে খুব দায়িত্বশীল সাড়া পেয়েছি আমরা এমনটা আমি বলতে পারছি না। যখন আমরা রানা প্লাজা ধ্বংসোত্তর সময়ে ভবন নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তাসহ ক্রমবর্ধমান অন্যান্য কমপ্লায়েন্স চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছি তখন দু-চারটা ব্যতিক্রম ছাড়া, আমার জানামতে, বেশিরভাগ ক্রেতা তাদের অদ্ভুত সব আব্দার অব্যাহত রেখেছেন যথারীতি। এরা এখনো সর্বশেষ শ্রমিক বেতন বৃদ্ধির পূর্ব অবস্থার পণ্যমূল্যের চাইতেও সস্তা মূল্যের জন্য রীতিমতো চাপ দিচ্ছেন সরবরাহকারীদেরকে। এই চাপে পিষ্ট হয়ে বেশ কিছু কারখানা হয় পুরো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করেছে। ক্রেতা সমাজের সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণ বর্তমান সময়ের সবচে' বড় চাহিদা। এই অবস্থা যখন বিরাজমান তখন কারখানা মালিক ও তাদের কর্মীবাহিনীর উদ্যোগী ভূমিকা বরং প্রশংসার দাবিদার। কারখানাগুলোতে এখন আর কর্মবিরতি বা সংঘাতের খবর পাই না। যার যার সাধ্যের চূড়ান্ত প্রয়োগ করে বর্তমান সংকটে টিকে থাকার অসাধারণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন সবাই। আমাদের ব্যাবিলনের প্রতিষ্ঠানগুলো তার থেকে আলাদা নয়। চলতি বছরটা ব্যাবসায়িকভাবে মোটেও স্বস্তিকর না আমাদের জন্য। তবে আমাদের প্রিয় কর্মীবাহিনী, ব্যবস্থাপনা সদস্যবৃন্দ স্বভাবসুলভভাবেই তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা দিয়ে ২০১৪ কে আরো নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। ব্যাবিলনিয়ানরা ধন্যবাদের তোয়াক্কা করে না। পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুধাবন করে সক্রিয়ভাবে সেরা উদ্যোগ গ্রহণ অনেকদিন থেকেই এদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

ব্যাবিলন কথকতার অগ্রযাত্রাকে ব্যাবসায়িক প্রতিকূলতা একটুও মন্থর করতে পারেনি। চমৎকার সব গল্প-কবিতা-নিবন্ধ সমৃদ্ধ হয়ে ৯ম সংখ্যা তাই অনায়াসে আত্মপ্রকাশ করতে পারলো। লেখা বাছাই কাজটা যেকোন সময়ের চাইতে বেশি কঠিন হয়ে গিয়েছিলো এবার। ফলে যা হয়েছে- পরবর্তী সংখ্যার জন্য হাতে রয়ে গিয়েছে বেশ ক'খানা প্রকাশযোগ্য লেখা। পরের সংখ্যা হতে যাচ্ছে দশম ও বিশেষ সংখ্যা। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য ব্যাবিলন কথকতার দশম সংখ্যা আরো অনেক নতুন লেখা সমৃদ্ধ হয়ে আপনাদের হাতে পৌঁছাতে পারবে এটা প্রায় নিশ্চিত। আশা করছি প্রাক্তন ব্যাবিলন সদস্যরাও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসবেন বিশেষ সংখ্যার জন্য তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে।

এবছরটাতে ব্যাবিলন পরিবারে ঘটে যাওয়া দু'একটা বিষয় উল্লেখ করার মতো। গেলো বছর থেকে আমরা নিউজেন টেকনোলজির (Newgen Technology Limited) মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি-সফট্ওয়্যার শিল্পে পদার্পণ করেছি। এবছর নিউজেন টেকনোলজির পাশাপাশি ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিমিটেড (Babylon Resources Limited) নামে আরেকটি

সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করেছে । এর ফলে ব্যাপক সম্ভাবনাময় তথ্য-প্রযুক্তি-সফট্ওয়্যার শিল্পে দৃঢ় সূচনা করতে পেরেছে ব্যাবিলন পরিবার- এমনটা ভাবা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবেনা ।

ব্যাবিলন পরিবারের কর্মী সদস্য-সদস্যাদের মধ্য থেকে আর্থিক প্রতিবন্ধীদেরকে খুঁজে বের করে এদের প্রতি বাড়তি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন ব্যাবিলন পরিচালকমন্ডলী ব্যক্তিগতভাবে । মানব-সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়ম করে ব্যাবিলন কর্মী সদস্য-সদস্যাদের বাড়ি ভ্রমণ করে এসে তালিকা তৈরী করে দিচ্ছেন ন্যূনতম সম্মানজনক জীবন-যাপনে অক্ষমদেরকে চিহ্নিত করে । এরপর মানব-সম্পদ কর্মকর্তাদের সমবেত সুপারিশক্রমে পৌঁছে যাচ্ছে সাহায্য সেইসব কর্মীদের কাছে । এবছর থেকে উদ্যোগটি চলতে থাকবে । ব্যাবিলন পরিচালকদের এই বিশেষ মনোযোগ ও উদ্যোগ অন্যদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করলে এই শিল্পের আপামর দরিদ্র শ্রমিককুল উপকৃত হবেন দরকারি কিছু বাড়তি সহযোগিতা পাওয়ার মাধ্যমে ।

ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাব আরেকটি সংযোজন এ বছরের । ব্যাবিলন সদস্যদের বেশ ক'জন মিলে ফটোগ্রাফিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে ক্লাবটি । ভীষণ উৎসুক সদস্যরা সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ছেন আশেপাশের জায়গাগুলোতে দলবেধে ছবি তুলতে । এতে করে ক্রমশ এদের আগ্রহ বাড়ছে- আর এদের হাতে উঠে আসছে প্রশংসা পাবার মতো অনেক ছবি । এটাও চলবে । ক্লাবের সকল সদস্যের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইলো ।

৮ম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অলংকৃত করেছিলেন আমাদের সুপরিচিত ও জনপ্রিয় কবি আসাদ চৌধুরী । ব্যাবিলন পরিবারে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এসে তিনি আনন্দ-বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন কিভাবে এই পরিবারে কর্তা-কর্মীর বিভেদ অস্পষ্ট হয়ে আছে । বাড়তি নজরদারি, খবরদারি ছাড়া সব ব্যাবিলন সদস্য কিভাবে দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে তা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন-তুলনা করেছেন এই ব্যবস্থাকে জাপান দেশের শিল্পে মালিক-কর্মীদের মধ্যে বিরাজমান অবস্থার সাথে । আমরা কবি আসাদ চৌধুরীর এই মনোভাব প্রকাশকে আমাদের সবার জন্য সম্মানের ও গভীর প্রেরণার মনে করি । ধন্যবাদ আসাদ চৌধুরী ।

আমার সহ-সম্পাদক মাহমুদ, বিশেষ সহযোগী তুষার, জেভিয়ার, আরিফ, প্রচ্ছদ শিল্পী ফারহানা, অলংকারিক তাওসিফ এবং শিল্প নির্দেশনায় যথারীতি স্বাধীন খান- এদেরকে ধন্যবাদ দেবার জন্য যথেষ্ট ভাষা নেই আমার সঞ্চয়ে । ওদেরকেসহ এই বার্ষিকীর সকল লেখক-লেখিকা, ঘরে ও বাইরের সকল শুভানুধ্যায়ীকে আমার বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা রইলো ।

২০১৫ সালের আগমনী আওয়াজ কাছে চলে আসছে দ্রুত । আমরা সবাই নিশ্চয়ই দেশ ও দশের জন্য অনাগত নূতন বছরটাকে পরিপূর্ণতা দিতে চেষ্টার ত্রুটি করবোনা । ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা সবার জন্য ।

এমদাদুল ইসলাম
সম্পাদক

ডিসেম্বর ১৫, ২০১৪ইং

ভোলা যাত্রার ইতিবৃত্ত

মোহাম্মদ হাসান
জেনারেল ম্যানেজার
ব্যাবিলন গ্রুপ

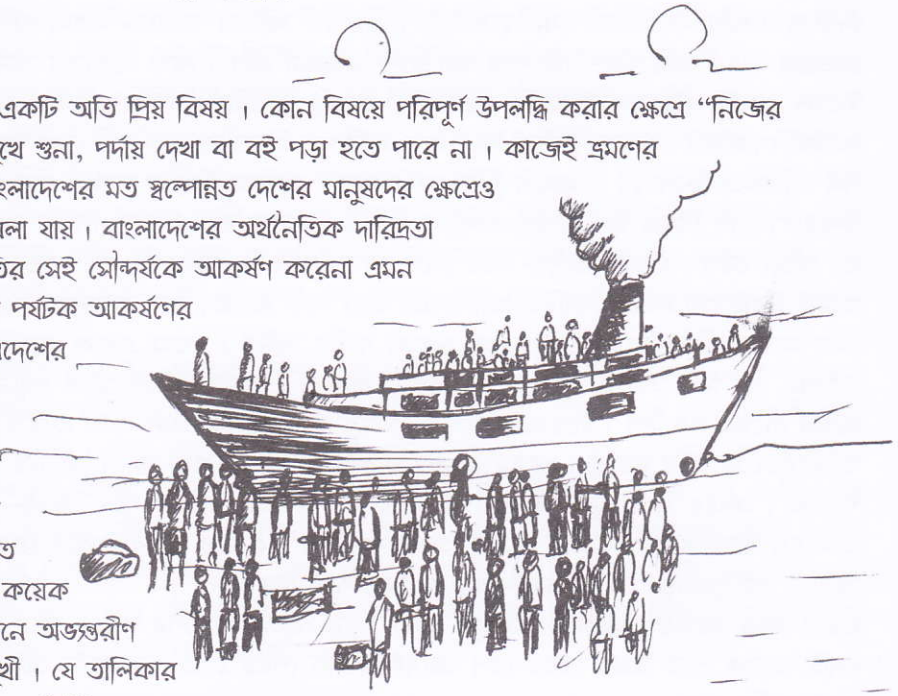

শখের তালিকায় অনেকের কাছেই ভ্রমণ একটি অতি প্রিয় বিষয়। কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে "নিজের চোখে দেখার" বিকল্প কখনো অন্যের মুখে শুনা, পর্দায় দেখা বা বই পড়া হতে পারে না। কাজেই ভ্রমণের জনপ্রিয়তা সার্বজনীন এবং সর্বাধিক। বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশের মানুষদের ক্ষেত্রেও পছন্দের তালিকায় ভ্রমণ বিষয়টি শীর্ষেই বলা যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দারিদ্রতা থাকলেও প্রাকৃতিক দারিদ্রতা নেই। প্রকৃতির সেই সৌন্দর্যকে আকর্ষণ করেনা এমন মানুষ পাওয়া ভার। ইউরোপ আমেরিকার পর্যটক আকর্ষণের কিছু বিষয় এদেশে অনুপস্থিত থাকলেও এদেশের ইকো টুরিজম আজকাল অনেক বিদেশী পর্যটকেরই আকর্ষণের স্থান। স্থানীয় টুর অপারেটরদের তথ্যমতে প্রতিবছর এদেশ থেকে আনুমানিক দশ লক্ষ লোক বিদেশে বেড়াতে যায়। দেশের ভিতরে ছুটি কাটাতে যাওয়া (হলিডে মেকার্স) লোকের সংখ্যাও কয়েক লক্ষ। বিদেশী পর্যটকদের পাশাপাশি বর্তমানে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমানভাবে উর্ধ্বমুখী। যে তালিকার আমিও একজন সদস্য। খুব ছোটবেলা থেকেই কিভাবে যেন ঘুরে বেড়ানোর শখটি আমার মধ্যে চেপে বসে। মনে পড়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে আমি একাই বোনের বাসায় বগুড়াতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। যখন আমার নিজের গ্রাম ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার পূর্বাভিজ্ঞতা ছিলো না।

ব্যাবিলনে যোগদানের দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই আমার শখের শীর্ষস্থানে থাকা বেড়ানো বিষয়টি ইচ্ছা থেকে বাস্তবে রূপ নেয়ার সুযোগ পেলো। চাকুরীর শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন, অগোছালো চর্চা থেকে এমন পেশাগত জীবনে প্রবেশ করবো তা কল্পনাতেও ছিলো না। চাকুরী জীবনের প্রথম পাঁচ বছর আমরা যারা ধানমন্ডির অফিসে বসতাম তাদের অনেকেরই কর্মঘন্টা কখনোই ১২ ঘন্টার কম ছিলো না। কর্মঘন্টার এই বিষয়গুলো যতটা না অফিসিয়াল আদেশ তার চেয়ে বেশী ছিলো ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, কাজের প্রকৃতি আর অফিস-ফ্যাক্টরীর দুরত্বের কারণে। একান্ত অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া কাউকে আমি ছুটি নিতেও দেখিনি। কখনো কখনো সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও অনেককেই অফিসে আসতে হতো। এই আত্ম-নিবেদন ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষের অগোচরে ছিলো না। কর্মী অন্তঃপ্রাণ ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিলো এক অনন্য ঘোষনা- যা আমরা কেউ চিন্তাই করিনি, স্বপ্নেও দেখিনি। ১৯৯৬ সালের কথা। আমাদের বিনোদনের জন্য বাধ্যতামূলক বার্ষিক ছুটি ঘোষণা করা হলো। ছুটির মেয়াদ দেশের ভিতরে দশ দিন, দেশের বাইরে গেলে চৌদ্দ দিন। সেই সাথে ভ্রমণ বাবদ একটা অতিরিক্ত বোনাস! এরকম আকস্মিক সুসংবাদ আমাদের কর্মস্পৃহা বাড়িয়ে দিলো অনেকগুন। বছরের শুরুতেই বার্ষিক ছুটির সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা করা হতো- যাতে কাজের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। ছুটি থেকে ঘুরে এসে ভ্রমনের টিকেট দেখাতে হতো প্রমাণের জন্য। বাধ্যতামূলক ভ্রমণ।

আমার ব্যাচেলর জীবনের ছুটিগুলোতে কোন না কোন বন্ধুকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। বিয়ের পর স্ত্রী-সন্তানদের সাধারণত এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করিনি। দেশের প্রায় সব প্রচলিত ভ্রমণস্থানসহ পাশের দেশের অনেক জনপ্রিয় স্থানগুলো আমার ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা পড়েছে। আমার পরিবারের অন্য কোন সদস্য সাঁতার জানে না। সেজন্যেই নদীপথে ভ্রমণের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ছিলো কম। কিন্তু ভ্রমণের তৃষ্ণা বড় মারাত্মক।

সমস্ত ভয়কে জয় করে নদীবেষ্টীত ভোলা ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। স্বভাবতই শিশুদের পানির প্রতি আকর্ষণটা একটু বেশিই

থাকে। ভোলা ভ্রমণের সিদ্ধান্তটা জানবার পর থেকে আমার সন্তানদের ক্যালেন্ডারের তারিখ গোনাটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠে। তাদের ভেতরে ভীষণ উত্তেজনা দেখতে থাকি। বেশ কিছুদিন আগে থেকে ওদের প্রস্তুতি আমাকে বেশ তাড়িত করে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো। পরিকল্পনা মোতাবেক বিকেল পাঁচটার মধ্যেই সদরঘাট পৌঁছাতে পারলেই চলে। কিন্তু শিশু অভিযাত্রীদ্বয় এবং তাদের মায়ের অতি সাবধানতা আমাকে বেশ আগেই গন্তব্যের দিকে রওনা করতে বাধ্য করে। বেলা দেড়টায় আমরা বাসা থেকে বের হয়ে পড়ি। ড্রাইভার আজিজ সদরঘাট যাবার প্রচলিত রাস্তার পরিবর্তে বেড়িবাঁধ দিয়ে গাড়ী ছোটালো। ওর অভিজ্ঞতা- এই পথে যানজটের সম্ভাবনা ক্ষীণ। লঞ্চে খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় পানি, ফল, চিপস্, চানাচুর ইত্যাদি কেনার পরিকল্পনা ছিলো শুরুতেই। যেহেতু নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই সদরঘাট পৌঁছে যাবো তাই ওখান থেকেই দেখেশুনে কেনাকাটা করা যাবে বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো। বলে রাখা ভালো আমাদের কারোরই সদরঘাট দর্শনের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না। আমার নিজেরও কখনোই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে যাওয়া হয়নি। আমার ছেলেটির বয়সের তুলনায় নানান বিষয়ে কৌতুহলটা একটু বেশী। বেড়িবাঁধের রাস্তার দু'পাশে নানা অসংগতি- নদীর মধ্যে বাড়ী কেন? পানির রং রঙিন কেন- ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে কখন যে মিটফোর্ড হাসপাতালের কাছে পৌঁছে গেছি তা টেরই পাইনি। আমরা সবাই আজিজের বৈষয়িক অভিজ্ঞতার জন্য ওকে ধন্যবাদ দিতে থাকলাম। ধন্যবাদ পর্ব শেষ না হতেই বুড়িগঙ্গা সেতুর (বাবু বাজার ব্রীজ) নিচে চোখে পড়লো চতুর্মুখী গাড়ীর জটলা। প্রথমে এটাকে স্বাভাবিক যানজট হিসেবে আজিজ গুরুত্ব দিতে চাইলেন না। কিন্তু অপেক্ষার প্রহর শুধু বাড়তে থাকলো। পনের মিনিট থেকে পৌনে এক ঘন্টা, গাড়ী এক জায়গায় নিশ্চল, মাছের চোখের মত স্থির। ইতোমধ্যে আমার ভেতরে এক ধরনের শংকা কাজ করতে শুরু করেছে। সহযাত্রীদের চোখে- মুখে- অভিব্যক্তিতেও চরম হতাশা। তাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা প্রশমিত করতে সামনে জ্যামের অবস্থা পর্যবেক্ষণে আমি গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। আমার মলিন মুখে ফেরা দেখে বাকী তিন সহযাত্রী সমস্বরে বলে উঠলো- কি হয়েছে? হরতাল? গন্ডগোল? এরপর আমাদের উদ্বেগের মাত্রা বাড়তে বাড়তে আরো দুই ঘন্টা পার হয়ে গেলো। পুরো তিন ঘন্টা ধরে আমরা এক জায়গায় আটকে আছি। এই দুরাবস্থার জন্য রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা, চালকদের শৃঙ্খলাহীনতা, সর্বোপরি অন্তঃসারশূন্য ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর মনের ক্ষোভ ঝাড়তে লাগলাম। অকস্মাৎ রাগটা গিয়ে আজিজের উপর পড়লো যখন জানতে পারলাম- আমাদের সহযাত্রী অন্য দলটি অনেক পরে রওনা হয়েও বেশ আগেই গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। সংবাদটি আজিজকেও বিচলিত এবং মর্মাহত করলো। ওরই বা কি দোষ।

ঘড়ির কাটা ছয়টা অতিক্রম করলো। বাকী পথটা হেঁটে যাওয়া যায় কিনা ভাবছিলাম। অন্যদের সায়ও মিললো। কিন্তু লাগেজগুলো? আমাদের নদী যাত্রা এবারের মতো যে ভেস্তে যাচ্ছে এটা এখন নিশ্চিত। লক্ষ্য করলাম আমার ছেলেটার চোখে জল, মেয়েটা অন্য দিকে ঘুরে নিঃশব্দে কাঁদছে। আমার মিসেসের জীবনটাই মিথ্যা হবার উপক্রম। এতদিনের পরিকল্পনা ট্রাফিক জ্যামের কাছে হার মানলো- ভাবতেই মনটা রাগে ক্ষোভে ভরে উঠলো। কি অসহায় আমরা!

আমি ওদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। তাদেরকে প্রস্তাব দিলাম আজ আর বাসায় না ফিরে ঢাকার কোন বড় হোটেলে গিয়ে উঠবো। কিন্তু এই প্রস্তাবে কেউ খুশী হয়েছে মনে হলো না। আজিজের বেড়িবাঁধ প্রস্তাব এবং আমাদের যাত্রাভঙ্গের জন্য সে নিজেও যে ভীষণরকম অনুতপ্ত ছিলো সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে বাসার পথে রওনা হবার পথ খুঁজছি- হঠাৎ বেশ কিছু রিকশা-ভ্যান চোখে পড়লো। পুরনো ঢাকায় গাড়ী চলাচলে সমস্যা থাকলেও রিকশা ভ্যানগুলো সহজেই সরু গলির ভেতর দিয়ে কেটেকুটে চলতে পারে। শিডিউল অনুযায়ী আরো প্রায় দেড়ঘন্টা আগে লঞ্চ ছেড়ে গেছে। ভোলা ভ্রমণ নাই বা হলো, সদরঘাট গিয়ে ঘাটে বাঁধা কিছু লঞ্চতো দেখে যাই- এই প্রত্যাশায় একটা রিকশা-ভ্যানকে পাঁচশত টাকায় রাজী করালাম। আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে পা তুলে ভ্যানগাড়িতে বসে গেলো। নয়াবাজার থেকে সদরঘাট- আমরা ছুটে চলছি মালামাল পরিবহনের ভ্যানগাড়ীতে। প্যাডেলে প্যাডেলে ভ্যানগাড়ী এগিয়ে চলছে আর আমার ছেলেমেয়ের মুখে এক একটা হাসির ঝিলিক খেলা করছে। জগন্নাথ কলেজের সামনে এসে ভ্যান থামলো। বাকী পথটুকু হেঁটে যেতে হবে। আমি লক্ষ্য করলাম এই একগাদা বাক্স পেটরা (লাগেজ) হাতে নিয়ে জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে কারো কোন ক্লান্তি নেই। যুদ্ধ জয়ের জোশ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

ইতোমধ্যে জানতে পারলাম আমাদের লঞ্চটি এখনো স্টেশন ছেড়ে যায়নি। আমার পরিবারের সকলের চোখে মুখে সেই মুহূর্তটিতে আমি যে আনন্দ দেখেছিলাম তা এখনো আমাকে আনন্দ দেয়। নির্ধারিত কেবিনে ব্যাগগুলো রেখে হাফ ছাড়লাম। ৫টার লঞ্চ কয়টায় ছাড়ে সেটা জানবার কৌতুহল হলো। আমাদের কেবিনের সামনে ইতোমধ্যে বিছানা বিছিয়ে জায়গা দখলের প্রতিযোগীতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যাত্রীরা। বোঝা গেলো লঞ্চ ছাড়তে আর খুব বেশি দেরী নেই। এতক্ষণে লঞ্চের বিলম্ব যাত্রার

কারণটাও জানতে পারলাম। লঞ্চ মালিকের স্ত্রী ভোলা যাবেন। তার আসতে দেরী হওয়ার কারণেই শত শত যাত্রীকে বসিয়ে রেখেই লঞ্চের এই বিলম্ব যাত্রা। ভেতরে ভেতরে এই সামন্তবাদী প্রথাকে ধন্যবাদ জানালেও নিয়মটাকে মন সমর্থন করলো না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল লঞ্চ মালিকদের অধিকাংশই রাজনীতিবিদ। এসব অনির্ধারিত, অঘোষিত দেরীতে যাত্রীরাও অভ্যস্ত।

বুড়িগঙ্গার পানির দুর্গন্ধ আমাদের নাকের ভিতর দিয়ে পাকস্থলীতে গিয়ে আঘাত করতে লাগলো। আমার মিসেস বমি করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকলো। বেড়ানোর আনন্দে তার সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। খালি পেটে তো আর বমি হয় না। সাড়ে ১০টার দিকে সদরঘাটের পন্টুন ছেড়ে সুবিশাল লঞ্চটি গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করলো। যাত্রা শুরুর পরবর্তী প্রায় দেড়ঘন্টা সময় পর্যন্ত নোংরা পানির দুর্গন্ধ সহ্য করতে হলো। নদীটাকে আমরা যে কি ভীষণভাবে দূষিত করে চলেছি! রাতের নদীকে দেখতে দেখতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম ভাঙলো প্রচন্ড এক ধাক্কায়। ভয় পেয়ে বাইরে এসে দেখলাম– আমাদের এই বিশাল লঞ্চটি অল্প পানির চড়ায় আটকে গেছে। নির্ধারিত সময়ে লঞ্চ ছাড়লে এখানে এসে এই ভাটির টানে পড়তে হতো না। অবশেষে সারেং সাহেব এবং তার দলবলের অনেক চেষ্টা এবং কৌশলের প্রয়োগে আমাদের জাহাজটি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হলো। সারেং সাহেব এবং তার দলবলের করিৎকর্মা হবার কারণ অবশ্য আমজনতার স্বার্থে ছিলো না। সকলেই ধন্যবাদ দিলো সেই ম্যাডামকেই। উনি লঞ্চে থাকাতেই ওদের লক্ষ্যনীয় তৎপরতা এবং সাফল্য বলে অন্য যাত্রীরা মনে করতে থাকলো।

যে কোন স্থানে যাবার আগে আমি বরাবরই সেই স্থান সম্পর্কে একটা ধারনা নিয়ে থাকি। ভোলা ভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যস্ততার কারণে আমার এই অভ্যাসটির ব্যত্যয় ঘটলেও লঞ্চে বসে পড়ার জন্য ভোলা সম্পর্কিত কিছু পুস্তিকা সঙ্গে করে নিয়েছিলাম। ভোলায় জমিদারী প্রথার ভিত্তি ছিলো বেশ শক্ত। বেশ কিছু জমিদার বাড়ী এখনও বিদ্যমান। সেই জমিদারী প্রথায় অভ্যস্থ ভোলাবাসী হয়তো বা মেনেই নিয়েছে একজন বিশেষ লোকের না আসা পর্যন্ত একটি বানিজ্যিক জাহাজের সব যাত্রীদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এবং এটাই নিয়ম। ভোলায় বৃটিশ আমলে লবন চাষ হতো। লবন কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে লবন চাষীরা আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩০ সনের ১লা বৈশাখ লবন চাষীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে দুইজন লবন চাষী মারা যান এবং এক সময়ে লবন চাষ বন্ধ হয়ে যায়। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভোলার শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ডে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল এই ভোলার সন্তান।

ভোলার অধিকাংশ অংশ ব্রিটিশ শাসনে থাকলেও মনপুরা দ্বীপটি ছিল পর্তুগীজ দস্যুদের দখলে। মহকুমা হিসেবে ভোলা নোয়াখালী জেলার অধীনে থাকলেও ১৮৬৯ সালে ভোলা বরিশাল জেলার অধীনে আসে। ১৯৮৪ সালে ভোলা মহকুমা থেকে জেলার মর্যদা পায়। নব্বই মাইল দীর্ঘ আর পঁচিশ মাইল প্রস্থের পুরো ভূখন্ডই সমতল ভূমি। বাংলাদেশের একমাত্র বৃহত্তম প্রাচীন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ভোলা জেলা যে কোন বিচারে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে। পলি মাটি সমৃদ্ধ উর্বর ভূমি আর ধান, সুপারি, নারিকেলে বিখ্যাত দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে নানা দস্যুপনা চলতে থাকে বৃটিশ আমল থেকেই। আরাকানের বর্গি, মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা দ্বীপটিকে ঘাটি বানিয়ে লুটপাট চালাতো এবং এদেশের মানুষের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কথিত আছে এই প্রেক্ষাপটেই রচিত হয় –

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে;
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিবো কিসে?
ধান ফুরালো, পান ফুরালো, খাজনার উপায় কি?
আর ক'টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।

পরের দিন ছিলো শুক্রবার। ভোলা শহর থেকে দূরে এক গ্রামের মসজিদে আমি জুমার নামাজ আদায় করছি। আমাদের শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার প্রতিবাদে সে সময় ঢাকায় হেফাজতে ইসলামী সমাবেশের আয়োজন করে। সেই যৌক্তিক প্রতিবাদের কাজটি ভোলার এক গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের বয়ানের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায়। তখনই ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আমি অবহিত হই। গ্রামের সেই ইমাম সাহেবের বয়ানের কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে যে যৌক্তিকতা এবং ব্যাখ্যা আমি লক্ষ্য করি, শহরের অনেক সম্ভ্রান্ত এলাকার মসজিদে নামাজ পড়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও কোন বিষয়ে এমন প্রতিবাদ করার সেই দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। এমন বিষয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি কিংবা প্রতিবাদের অংশ হিসেবে নিজ দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে সেটা যে আর প্রতিবাদ থাকে না। হয়ে যায় পাপের মত গর্হিত কাজ। ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি উপস্থাপনের মাধ্যমে ইমাম সাহেব বুঝাতে চাইলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের দায়িত্ব হলো সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ-জান এবং মালের সংরক্ষণ করা। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশেই সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে নিরাপদে থাকবে সেটাই ইসলামের শিক্ষা। আমি ঐ ইমামের কাছ থেকে এত সুন্দর ব্যাখ্যা আশাও করিনি। নামাজের পরে মুসল্লিদের মধ্যে

কোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হওয়ার জন্য আমি ইমাম সাহেবের ঐ ব্যাখ্যাকেই কৃতিত্ব দিতে থাকি।

ঢাকা ফেরার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার আগেই লঞ্চ ঘাটে আসতেই আমার ছেলের জিজ্ঞাসা– বাবা লঞ্চ কেন রাতে চলে? প্রকৃত উত্তর আমার জানা না থাকাতে ঝটপট উত্তর দেই– লঞ্চ চালকেরা দিনে ঘুমায় আর রাতে জেগে থাকে বলে। ফিরতি পথে আমার সন্তানেরা পানির দুর্গন্ধের সাথে সদরঘাট এবং এর আশেপাশের দুরাবস্থা দিনের আলোতে প্রত্যক্ষ করে। লক্ষ্য করলাম ভোলা ভ্রমণের আনন্দ অনেকটাই মিলিয়ে যেতে থাকে। অফিস থেকে বাসায় ফিরলে আমার দ্বিতীয় শ্রেনীতে পড়ুয়া ছেলেটি একটি কাগজের খাম দিয়ে বলে– বাবা অফিসে গিয়ে খুলবে। ওর কাউকে সারপ্রাইজ দেবার ধরনটাই এমন। অফিসে গিয়ে খুলে দেখি বুড়িগঙ্গা নদীকে নিয়ে ওটি একটি চিত্রকলা। আমি একটি জাতীয় দৈনিকে চিত্রকলাটি পাঠিয়ে দিলে ওরা তাদের পরের দিনের সংখ্যায় ছাপিয়ে দেয়। আমাদের ভ্রমণ ঝুড়িতে জমা হয় ভোলা যাত্রার অনেক না ভুলা অভিজ্ঞতা।

বৈশাখী হৃদয়

এ এইচ এম সামিউল বাশার রাজা
অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

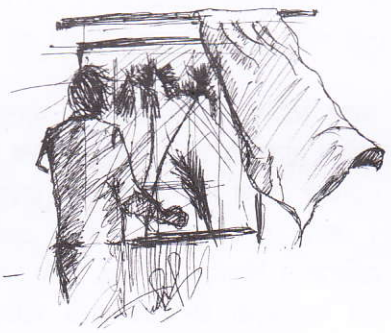

আজ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন।
আমার জানালার বাইরের অন্ধকার আকাশ
আর তারাদের সাথে কথা বলছি।
বাতাসটা খুব মিষ্টি,
সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে রাখে,
ইশ, মনের জানালাটা দিয়েও যদি এমন বাতাস আসতো।

একাকী এই জীবনে বেঁচে থাকার মতো
যথেষ্ট মুক্ত বাতাসের বড় অভাব।
জটিল জীবনের পিছু হাঁটা
আর আপোষ করতে করতে
খাদের কিনারায়ই দাঁড়িয়ে আছি।

আহ! আজ যদি তুই পাশে থাকতি
মনের জানালা খুলে একটু বাতাসের স্পর্শ নিতাম।

আবার আসবেন কিন্তু

কাজী এ এম তুষার আলম
সহকারী ম্যানেজার, এইচআর এন্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর কর্মকান্ড আমাকে ভীষণ অভিভূত করে। এর বহুমাত্রিক রূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগে লন্ডভন্ড মানুষের পাশে যেমন দাড়ায়, শীতার্ত মানুষদেরকে একটুখানি উষ্ণতা দেবার জন্য একইভাবে এগিয়ে যায়। অস্বচ্ছল অথচ অদম্য মেধাবীদের শিক্ষাজীবন সচল রাখতে ব্যাবিলন যেমন শিক্ষাবৃত্তি দেয়, একইভাবে জ্ঞানের বহুমাত্রিক আলোতে আলোকিত করার জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করে স্কুলে স্কুলে। মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতির জন্য ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস, ফ্রি হেলথ্ ক্যাম্প, রক্তদান কার্যক্রম, আহ্সানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে আর্থিক সহায়তা ব্যাবিলনের সিএসআর বৈচিত্রেরই অংশ। ব্যাবিলনে কাজ করতে করতেই এর সিএসআর কার্যক্রমগুলোর সাথে কখন যে জড়িয়ে পড়েছি! সফটি, ব্যাবিলন বৃত্তি প্রকল্প, শীতবস্ত্র বিতরণ, কথকতা প্রকাশ এসব কার্যক্রমের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্তি রয়েছে আমার। এই সম্পৃক্তি আমার ভেতরে অসাধারণ অনুভূতির জন্ম দেয়।

সত্তর দশকের কথা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সর্বগ্রাসী করালে বিধ্বংস দেশের শিশু, বালক-বালিকাদের মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা দান ও পারিবারিক পরিবেশে গড়ে তোলার মানবিক দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেন স্যান্ড্রা সিম্পসন (Sandra Simpson)। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, এল সালভেদর, কম্বোডিয়ার মতো অনুন্নত দেশে গড়ে তোলেন এফএফসি (FFC-Families For Children) তথা বেবি হোমস্। স্যান্ড্রা কানাডিয়ান নাগরিক। তাঁর ভালোবাসা আর মাতৃমমতা তাঁকে বিশ্ব নাগরিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ঢাকার উত্তরায় নয় নম্বর সেক্টরে এফএফসি'র অনাথ আশ্রম দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবন্ধী-অনাথদের মায়ের স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছে। বর্তমানে প্রায় দুইশত জনের মতো শিশু, বালক-বালিকা নিয়ে এফএফসি পরিবার। এদের খাওয়া-পরা, শিক্ষা-চিকিৎসা, মানবিক বিকাশ সবই করে থাকে এফএফসি কর্তৃপক্ষ। প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের জন্য রয়েছে আলাদা পরিচর্যা কেন্দ্র। ব্যাবিলন কয়েক বছর আগে থেকেই এই অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এফএফসি'র সন্তানদের শিক্ষা-চিকিৎসা-স্বাস্থ্য এবং খাওয়া-দাওয়ার একটা বড় দায় কাধে তুলে নিয়েছে ইতোমধ্যেই। এফএফসির সম্পর্কে বেশি কিছু জানা ছিলো না আমার। ব্যাবিলন কথকতার অষ্টম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এমদাদ স্যার অল্প বিস্তর পরিচয় দেন এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে। সেই থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আমার আগ্রহ তৈরী হয়। আর সেজন্যই পীর ভাইয়ের এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। তৌফিক ভাই আর সবুজ ভাইকে নিয়ে তিনি এফএফসিতে যাচ্ছিলেন মাসিক খরচের যোগান দিতে এবং একটা ছোট্ট পরিদর্শন করতে।

উত্তরার অনাথ আশ্রমের সামনে গাড়ি থামলো। আমরা অফিস কক্ষে পৌঁছাতেই আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন শিখা ম্যাডাম। এতগুলো ছেলেমেয়েদেরকে পরম মমতায় নিয়ত আলোকিত করে যাচ্ছেন তিনি। এখানকার নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বহুদিন ধরে। প্রাণখোলা হাসি দিয়ে এই অনাথ আশ্রমের সবাইকে হাসি-খুশি এবং উচ্ছল রাখার নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন শিখা ম্যাডাম। এই পরিবারের সকল সদস্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চাহিদার সকল হিসেব-নিকেশ শিখা ম্যাডামের নখদর্পণে। ম্যাডামের সাথে কথা হচ্ছিলো আমাদের।

একটা মেয়ে ঝড়ের বেগে অফিস কক্ষে ঢুকে একই গতিতে বের হয়ে গেলো। শিখা ম্যাডাম বললেন- ওর নাম অনিতা। ওকে খুব ছোট্ট বয়সে একটা বেসরকারী সংস্থা আমাদের এখানে রেখে যায়। সেই থেকে ও এখানেই আছে। ঘরে এসেছিলো মেডেলগুলো দেখতে। ও একজন জিমন্যাস্ট। অনেক পুরস্কার পেয়েছে সে। একটু পরে আবার উচ্ছল গতিতে অফিস কক্ষে ফিরে এলো অনিতা। ওর মেডেলগুলোতে আলতো পরশ বুলিয়ে যেতে লাগলো।

–নাম কি তোমার? আমি জিজ্ঞেস করলাম।
–অনিতা। খুব সরল কিন্তু দৃঢ় উত্তর অনিতার।
–খুব সুন্দর নাম। কে রেখেছে?
–ঐ ম্যাডামের বড় ভাই। ম্যাডামের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে অবিচল উত্তর দিলো অনিতা।
–তুমি কী খেলো?
–অনিতার চোখ ঝলমল করে উঠলো।
–স্যার আমি অনেক খেলা খেলতে পারি। আমার অনেক পুরস্কার আছে। আমি আনসার দলের হয়ে খেলছি। দৌড়, ঝাপ থেকে শুরু করে সবকিছু।
ওর হরিণের মত চঞ্চলতা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করলো।
দোতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত যেতে যেতে অনেক শিশু কিশোরের সাথে আমাদের দেখা হলো। কেউ খেলছে, কেউ স্কুল-কলেজ থেকে ফিরছে, কেউ দুষ্টুমিতে ব্যস্ত। তিনতলায় উঠে আমরা তো অবাক। শিশুদের বিকাশের জন্য কম্পিউটার, হস্তশিল্পসহ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ চলছে। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় বাইরের স্কুল-কলেজগুলোতে। আট-দশজন রয়েছে যারা কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে। ওদের পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছে ব্যাবিলন গ্রুপ। মানবিক বিকাশের সকল চেষ্টার ফলে এখানকার শিশুদের কেউ ভালো গান করে, কেউ খুব ভালো ছবি আঁকে-নাচতে পারে। ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ঢেউ খেলিয়া যায়রে-কেউ একজন গুনগুন করে গাচ্ছিলো। তিনতলায় অটিস্টিক (Autistic) শিশুদের সেকশনটাতে গিয়ে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম।
পীর ভাই জিজ্ঞেস করলেন- কেমন আছো তোমরা?
–আমরা সবাই ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন? ঐক্যহীন কোরাসে শিশুরা আমাদের কুশল জানতে চাইলো।
প্রতিবন্ধী শিশুদের এমন উচ্ছলতা আমাদেরকে নাড়া দিলো। আমি তাদের বেশ কিছু ছবি তুললাম। তাদের আনন্দ বেদনার কাব্য ফ্রেমে বন্দী হলো।
আমরা অফিস রুমে ফিরে এলাম। একটা মন্তব্য লেখার বই আছে অফিস কক্ষে। মন্তব্য লিখতে গিয়ে হাত আটকে যাচ্ছিলো, বুকটাও ভারী হয়ে যাচ্ছিলো।

এফএফসি'র এই পরিবারে খুব অল্প সময়ের উপস্থিতি আমার ভেতরে একটা স্থায়ী অনুভূতির জন্ম দিলো। আনন্দের অনুভূতি; বেদনার অনুভূতি! ব্যাবিলনকে ধন্যবাদ। ব্যাবিলনের অকুণ্ঠ আর অব্যাহত সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা অনেক ভালো আছে।

বিদায় নেবার সময় হলো। ঘন্টা-দেড়ঘন্টার মধ্যেই সরল সাবলীল শিশু কিশোরদের সাথে যে দ্বিপাক্ষিক সখ্যতা গড়ে উঠেছে বিদায়ের সময়ে তা টের পেলাম। উচ্ছল ছলছল চোখগুলো ভালোবাসার হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে-

ভাইয়া আবার আসবেন কিন্তু।
আমি বললাম- আবার আসবো ভাইয়া.....

প্রার্থনা শূন্যতার কাছে

এস এম আরিফ রাজ্জাক
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ব্যাবিলন ট্রিমস্ লিমিটেড

১।
অতীতেরও অনেক আগে
সময়হীনতার লীন বলয়ে
নিরাকার মহাশূন্যতায়
একা নিঃসীম অস্তিত্ব
একাকিত্বের যন্ত্রনায় কাতর।
তখন নিরেট স্তব্ধতা।
কেউ কোথাও নেই
শুধুই অতলান্ত শূন্যতা।
শূন্যতার সুতীব্র যন্ত্রনা
শুধুই শূন্যতায় শেষ হয়।
কে তুমি লুকিয়ে আছ
শূন্যতার ওপারে?
তুমি চাইলেই শূন্যতা
গর্ভবতী হয়
সৃষ্টির এষনায়।
তুমি চাও –
বিস্ফোরিত হয় বিন্দু
বৃত্তের ব্যাসে
উদ্ভাসিত প্রোটো আলোয়
অনু ও পরমাণুর পর্দায়।
ওখানে আদি প্রাণ
অনির্দিষ্ট শীত নিদ্রায়।
সময় প্রপাতিত হয়
শূন্যতার হৃদপিন্ডে
রক্তের বুদ্বুদে।
সংখ্যাতীত পরমাণু
মিলিত হয়
নিবিড় অভিকর্ষে
ক্ষয় ও ঝঞ্ঝায়
জ্যোতি ও তমার সংঘর্ষে।
তারপর এক পরম নীরবতা–
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়
অমেয় ব্যাসের জঠরে
নক্ষত্রের ভ্রূণ বেড়ে ওঠে
সময়ের নরম ওমে।
সময়ের নাড়ি চিড়ে
উঁকি দ্যায় নবীন ব্রহ্মান্ড।
নীলিম আলোর প্লাবনে
তমার লুপ্তি।
তখনো নিঃসঙ্গতার
উত্তপ্ত জরবিন্দু
জলাবর্তে উত্তাল।
নিরাকারের অবয়ব
শুধুই অবয়বহীন
নবীন ব্রহ্মান্ডের আয়নায়।

২।
তখন অমেয় ব্যাস বিভাজিত
সময় ও সময়হীনতার
অনুমধ্যমায়।
নবীন ব্রহ্মান্ড বেড়ে ওঠে ক্রমাগত
সময়ের অধিবৃত্তে।
নক্ষত্রেরা বেড়ে ওঠে
কনার অঘোর অভিকর্ষে
আলোর আন্দোলিত স্রোতে।
তখন তমার ঘোষণায়?
জ্যোতির অবিমিশ্র বিভা।
অথচ সময়ের ওপারে
নিরাকার তখনো রিক্ত
নিস্তল নিঃসঙ্গতায় সিক্ত।
বোধের প্রান্তে অতলান্ত শূন্যতা
আর অয়োময় অবয়বে অপূর্ণতা।
তুমি চাও
বিম্বিত হোক তোমার
অনুদ্ভিন্ন ছায়া উদ্ভিন্ন আয়নায়।

৩।
সময় তোরণ খুলে যায়।
অধিবৃত্তের জঠর ছেড়ে
নিযুত নক্ষত্রেরা পা বাড়ায়
এক অসীম অক্ষের তট ছুঁয়ে
অচ্ছুৎ আঁধারের কক্ষ পথে।
অনিকেত যাত্রায় অজস্র নক্ষত্রেরা
চূর্ণিত হয় অনিবার্য অভিঘাতে
ব্রহ্মান্ডের প্রথম রিরংসায়
অক্ষতট দখলের যুদ্ধে।
সময় রাজ্যে এটাই প্রথম যুদ্ধ।
আহতরা অসংখ্য খন্ডে খন্ডিত
জ্যোতিহীন, অজ্ঞাত যাত্রায়।
আর যারা বেঁচে যায়
প্রতিস্থাপিত হয় নিজের কক্ষে ঘূর্ণাবর্তে
প্রতিপ্রসারিত বৃত্তে।
জ্যোতির শক্তিতে ক্রমাগত নিবিড় হয়
নিষ্প্রাণ কনার মন্ড–
সদ্য প্রসুত গ্রহ।
বায়বীয় নক্ষত্রের অক্ষে
অনিকেত যাত্রা শেষ অবশেষে
নতুন কক্ষপথের অনুবৃত্তে।
তখনই সময়ের প্রথম উষা।

৪।
সময়ের তটরেখা প্রপ্রসারিত হয়
প্রতিফলিত শক্তির সংখ্যাতীত বুদ্বুদে।
কোয়ার্কের আকর্ষণে শক্তির জারণে
কনার পিন্ড বেড়ে ওঠে গ্রহে।
প্রজ্জলিত নক্ষত্রের অক্ষতটে
নবীন গ্রহের বসতি।
নক্ষত্রেরা ক্রম নিবিড় হয়
সময়ের চক্রাবলে
প্রজ্জ্বলিত জ্যোতির স্ফটিক মালায়–গ্যালাক্সি।
গ্যালাক্সির হৃদপিন্ডে তখন
উদ্ভাসিত প্রোটো আকাশ।

৫।
তখনো রিক্ততা
শূন্যতার ধমনী বেয়ে
বোধের হৃদপিন্ডে ।
সময়হীন অধিবৃত্ত
বিচল নিস্তব্ধতায় নিমজ্জমান ।
সত্ত্বার হৃদপিন্ডে ঝড় ।
স্নায়ুতন্ত্রে অস্পন্দিত জর
অজরের অসম্পূর্ণ ঘর-
প্রমূর্ত সত্ত্বায়
প্রবিলিত হতে চায় ।
বিশ্রস্ত অবয়ব
আঁধারের প্রলয়ে
তখনো গ্রাসিত বোধের শিকড়ে ।
প্রলয় শেষে উৎসন্ন আঁধারের প্রণতি
জ্যোতি বিদলিত নেতির
নিরাকার শক্তির
নিরঙ্কুশ আধিপত্যে ।
তখন জরের কোলাজ
নিষিক্ত হয় সময়হীনতার জঠরে
শক্তির ওমে বেড়ে ওঠা ভ্রূণের
শেষ যাত্রা সময় বৃত্তের অধিপ্রান্তে ।

সচেতন

মোঃ মাহমুদ হাসান
এ্যাসোর্টম্যান, ফিনিশিং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি-
সারাদিন যেন ধুমপান এড়িয়ে চলি ।
ধুমপান করলে হয় স্বাস্থ্যের অবনতি
এর সাথে আরো হয় অর্থেরো ক্ষতি ।
ধুমপানে বিষপান দ্রুত তাকে ছাড়ো,
সুন্দর পৃথিবীকে করো সুন্দর আরো ।

আগুন

মোঃ রবিউল ইসলাম
সিনিয়র অপারেটর, সুইং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আগুন, কাজ যার জ্বালানো
আর তা কোন কর্মস্থলে লাগলে-
মানুষের কাজ হয় পালানো ।
তবে না পালিয়ে ভয়ে, সাহস যোগাও মনে ।
সবাই আমরা জনে জনে-
ধর ফায়ার এক্সটিংগুইসার, চেষ্টা করো বাঁচার-
মারো আগুনপানে, তাতে বাঁচবে সবাই জানে ।
ধর হোজরীল পাইপ, এবার তাক করো আগুনে,
পানি মারো বুঝে শুনে ।
আগুন যদি লাগে তোমার গায়ে,
দৌড়িওনা ভয়ে, পড়বে তুমি শুয়ে,
করবে গড়াগড়ি, আগুন নিভবে তড়িঘড়ি ।
ধোঁয়ায় যদি চারিদিকে ধরে তোমায় ঘিরে
নিঃশ্বাস নিতে পারছোনা তো একটু কোন মতে-
শুয়ে তুমি পড়বে সেথায় নাকটা মাটির দিকে ।
সারি হয়ে নামবো মোরা কেউনা পথে থামি,
জীবন মোদের সবার কাছে টাকার চেয়েও দামি ।

আমার ছোট বোন, আমরা ও থ্যালাসেমিয়া

আয়শা সিদ্দিকা আরজু
ওয়েলফেয়ার অফিসার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

আমি, তুমি, আমরা সবাই- আমাদের সকলের অনেক কিছুই বলার থাকে, অনেক কিছু বলতে চাই কিন্তু শুনবার লোক নাই। আমি যা বলতে চাই তা কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনতেও চায় না, কারণ যে শুনবে তারও তো কিছু বলার থাকে। হয়তো সে জন্যই আমি, আমরা সকলেই সারাক্ষণই নিজের সাথে কথা বলি। সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁত মাজতে মাজতে নিজের সাথে অনেক কথা বলি। অফিসে কাজের ফাঁকে অথবা অন্য কোন অবসর সময়ে নিজের সাথে নিজে কথা বলি।

আমি লেখিকা নই, চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারি না কিন্তু আমি খুব ভালো ভাবতে পারি। সময়ে-অসময়ে, ঘন্টার পর ঘন্টা আমি নিজে নিজে ভাবতে থাকি, ঘন্টার পর ঘন্টা নিজের সাথে নিজে কথা কাটাকাটি করি।

অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে করছিলো কিছু লিখবো, নিজের লেখা ছাপানো অক্ষরে দেখবো ভাবতেই ভালো লাগে কিন্তু কি বিষয়ে লিখবো কিংবা যে বিষয়টি ভাবছি তা বুঝিয়ে লিখতে পারবো কি না সেটাও আরেক ভাবনা।

ব্যাবিলন গ্রুপে যোগদান করার পর "ব্যাবিলন কথকতা" দেখলাম। অবাক হলাম- এখানে সবার লেখার সুযোগ আছে এবং সকলে এখানে নিজের সুপ্ত প্রতিভা এবং নিজের ভিতরের ভাবনাগুলো ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পায়। তাই ভাবলাম আমিও একটু চেষ্টা করি।

যে বিষয়টি নিয়ে ভাবছি সেটা আসলে "ব্যাবিলন কথকতায়" লেখার উপযুক্ত কি না জানি না। তবুও ঐ যে বললাম, নিজের আনমনে ভাবতে থাকা কথাগুলো, যা কাউকে বলতে পারিনা বা বলতে চাইলেও কারো শোনার সময় থাকেনা সেটাই লিখতে চাই। হয়তো কথকতাই আমার কথাগুলো শুনবে এবং তার বুকে ধারণ করবে।

আজ ১১ এপ্রিল ২০১৪, শুক্রবার। ভেবেছিলাম ঘুম থেকে একটু দেরী করে উঠবো। কিন্তু বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় মাথার উপরে ঘুরতে থাকা ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রচন্ড গরম লাগছিলো, তবুও ঘুমানোর জন্য বৃথা চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু না, শুয়ে থাকা হলো না। বিছানা ছেড়ে সুন্দর করে বিছানাটি গুছিয়ে রাখলাম। ঘুমাতে না পারায় এবং গরমে সকাল বেলায়ই মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গেলো। ফ্রেশ হয়ে রান্না ঘরে গেলাম, দেখলাম- মা নারকেল পিঠা বানাচ্ছেন। একটা হাতে নিয়ে মুখের কাছে নিতেই মা থামিয়ে দিলেন। বললেন-এখন খাওয়া যাবে না, আগে একটু লবন দিয়ে রসুন খেয়ে নে। অবাক হয়ে মাকে বললাম-কেন?

মা বললেন- কাল রাতে অফিস থেকে ফেরার সময় অল্পের জন্য এত বড় একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলি, ভয়ে রাতে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়লি, আর বলছিস-কেন!

তখন কাল সন্ধ্যেবেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি স্মরণ করলাম। সত্যিই কি যে হয়েছিলো কাল! ১০ এপ্রিল ২০১৪, বৃহস্পতিবার- যা কখনো হয়নি তাই হলো। অফিস থেকে ফেরার সময় গুলিস্তান-ধামরাইয়ের গাড়িতে উঠলাম। বসার জন্য সিট না পাওয়ায় ড্রাইভারের পাশের ইঞ্জিনের উপর বসলাম। বাসটি ব্যাংক টাউন ক্রস করার পর পরই হঠাৎ আমার ওড়নাতে প্রচন্ড টান লাগলো এবং কেমন যেন গরম হয়ে উঠলো, আমি জোরে একটা চিৎকার দিলাম। ড্রাইভার বললো- ইঞ্জিনের ভিতরের পাখার সাথে ওড়না পেঁচিয়ে গেছে। দেখতে দেখতেই ওড়নার অনেকটুকু অংশ পেঁচিয়ে গেলো। ড্রাইভার তারপরেও গাড়ি চালিয়েই যাচ্ছিলো। মহিলা সিটে বসে থাকা একজন ভদ্রমহিলা ড্রাইভারকে ধমক দিয়ে গাড়ি থামাতে বললেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও ওড়নাটি ছাড়াতে পারছিলাম না। তখন সেই ভদ্রমহিলা টেনে আমার ওড়নাটি ছিঁড়ে ফেললেন আর আমাকে অনেক

ধমকাতে লাগলেন, বললেন-বাসে কিংবা রিকশায় বসার সময় সামলে বসতে পারোনা? কি বিপদ হতো এখন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি একদম চুপসে গেলাম। প্রচন্ড ভয়ে মুখ দিয়ে কোন কথাই বলতে পারলাম না। ডান হাতের কব্জিতে খুব জ্বালা করছিলো। বাসায় ফিরে খেয়াল করলাম- ডান হাতের অনেকখানি অংশ ছিলে গেছে, মনে হলো যেন পুড়ে গেছে। ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে হাতে মাখলাম। মা বার্নসিল এনে লাগিয়ে দিলেন। নিজের এই ভয়, ব্যথা সবকিছু নিমিষেই চলে গেলো যখন ছোট বোনটার মুখের দিকে তাকালাম। কি মায়াবি দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যান্য দিনের মত সুস্থ্য থাকলে আমাকে সেবা করতে শুরু করতো। কিন্তু আজ ইচ্ছে থাকলেও তা পারছেনা। দেখলাম- বরাবরের মতোই ঠোঁট দুটো সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, শরীরটা একদম হলুদ, মুখটা ফ্যাকাশে, হাত-পা এবং শরীরের তুলনায় পেটটা অনেক বড় হয়ে গেছে... আবারও ব্লাড লাগবে।

মাকে জিজ্ঞেস করলাম- ব্লাড কি জোগাড় হয়েছে? মা বললেন- তোর আব্বা অনেক জায়গায় খোঁজ নিয়েছেন, পাননি। দুপুরে দু'টো ছেলেকে নিয়ে এমদাদ (পাশের বাসার) এসেছিলো। তোর আব্বা ওদের নিয়ে ক্লিনিকে (সুপার ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সাভার- আব্বা এখানে চাকুরী করেন) গেছেন।

আর কোন কথা বলতে পারলাম না। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আমার রুমে চলে গেলাম, ভাবলাম-আর কতোদিন? আল্লাহ এত সুন্দর মিষ্টি একটা মেয়েকে কেন এভাবে এত কষ্ট দিচ্ছেন? আমার বাবা-মা কিংবা আমরাই বা আর কতোকাল এভাবে পরীক্ষা দিয়ে যাবো?

মনে পড়ে গেলো ১৯৯৯ সালের সেই দিনের কথা। প্রতিদিনের মতো সেইদিনও বিকেল বেলা খেলা শেষে মাগরিবের আযানের সাথে সাথে বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে পড়তে বসলাম। আব্বা তখন "বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা" প্রতিষ্ঠানে সরকারী চাকুরী করতেন। আব্বা তখনো বাসায় ফিরেননি। আমি, ভাইয়া ও আমার ছোট ভাই সাইফুল আমরা পড়তে বসলাম। একটু পর ছোট বোনটি এসে পাশের বিছানায় শুয়ে কেমন যেন ছটফট করতে লাগলো। আমি এবং ভাইয়া ওর কাছে গিয়ে বসে জিজ্ঞেস করছি- তুহিন (আমার ছোট বোনের নাম) কি হয়েছে? ও কোন কথা বলতে পারছিলোনা। আমি চিৎকার করে মাকে ডাকলাম- ওমা, মা, দেখ তুহিন যেন কেমন করছে। ততক্ষনে আব্বাও অফিস থেকে চলে এসেছেন। আমার চিৎকার শুনে আব্বা এবং মা দু'জনেই দৌড়ে আসলেন। ওর অবস্থা দেখে আব্বা ভাইয়াকে রিকশা ডেকে আনতে বললেন। আব্বা আর ভাইয়া তুহিনকে নিয়ে সাভারের একটি বেসরকারী ক্লিনিকে গেলেন। সেখানকার ডাক্তার বললেন- ওকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যেতে হবে। সেই রাতেই মুখে নেবুলাইজার দিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে ওকে ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। হলি ফ্যামিলির ডাক্তার ওর অনেকগুলো টেস্ট করালেন। তারপর রিপোর্ট দেখে আব্বাকে জানালেন- আপনার মেয়ের থ্যালাসেমিয়া হয়েছে, এখন থেকে প্রতি তিন মাস পর পর ওকে ব্লাড দিতে হবে। ডাক্তারের কথা শুনে আব্বা বসে পড়লেন। বললেন- আরেকজন!! কারণ, ঠিক একই অসুখে আমার দশ বছরের একটি বোন (বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান) মারা যায়।

"থ্যালাসেমিয়া" একটি অসুখের নাম। "থ্যালাসেমিয়া" আমাদের পরিবারের জন্য একটি আতঙ্কের নাম। ডাক্তারদের মতে এটা এমন একটি অসুখ যা মানুষের ব্লাড সেলকে অকেজো করে দেয়, যার ফলে শরীরে ব্লাড উৎপাদন হয়না এবং হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ব্লাড সেল অকার্যকর থাকার দরুণ কোন ধরনের খাবার অর্থাৎ কোন পুষ্টিকর খাবারেই (শরীরে ব্লাড উৎপাদনে সহায়তাকারী) কোন কাজ হয়না। ডাক্তাররা বলেন যতদিন বেঁচে থাকবে শরীরে আলাদা ব্লাড দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে

সেই থেকে শুরু। প্রতি মাসে ওকে ব্লাড দিতে হয়। শরীর ভালো থাকেনা বলে আর দশটা ছেলেমেয়ের মত দৌড়ঝাপ করতে পারেনা। একটু খেলাধুলা করলেই হাঁপিয়ে যায়। পড়াশুনার প্রতি ও খুব আগ্রহী। বেশী প্রেসার নিতে পারে না। আমরাও প্রেসার দেই না। যতটুকু পারে সেটুকুই যথেষ্ট। এখন ও নবম শ্রেণীর ছাত্রী। নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না, তবুও খুব চেষ্টা করে। ও খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে। মাঝে মাঝে আমাকে বলে-বড় আপু আমি এইচএসসি পাশ করলে আমাকে আর্ট কলেজে ভর্তি করে দিস। আমি মনে মনে বলি- আল্লাহ তোকে ততোদিন যেন বাঁচিয়ে রাখেন, আল্লাহ তোর মনের আশা পূরণ করুণ। ওর অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যাচ্ছে। এখন ব্লাড দিলে একমাসও যায় না। আব্বা রিটায়ার করেছেন। তারপরও চাকুরী করতে হচ্ছে। সরকারী চাকুরী করে গাড়ি-বাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স কিছুই করতে পারেননি। ডাক্তাররা বলেন,

এই রোগের চিকিৎসা বাইরে নিয়ে গেলে হতে পারে কিন্তু সেই সামর্থ আমাদের নেই। অন্যের শরীরের ব্লাড দিয়ে আর কতোদিন আমার আব্বা তার মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবেন? আর কেনা ব্লাডে কোন বিশ্বাস নেই, পেশাদার ড্রাগস এডিক্টরাও ব্লাড দেয়। ফলে সেটা খুবই রিস্ক, আর এত ফ্রেশ ব্লাডইবা কোথায় পাবো?

হয়তো ধীরে ধীরে একদিন আমার আদরের ছোট বোনটির জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। আব্বা আমাদের তিন বোনকে বলেন- তার জান। আমাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আজও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। যখন ব্লাড দেয়ার সময় হয় তখন অসহায়ের মতো বিভিন্ন মানুষের কাছে ব্লাডের জন্য কাকুতি-মিনতি করেন। জানিনা মহান আল্লাহ কতদিন আমাদের পরীক্ষা করবেন- এর শেষই বা কোথায়?

শরীরের তুলনায় তুহিনের পেটটা অনেক বড়, তাই রাতে ঘুমানোর সময় খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। সকালে আরবি পড়াতে হুজুর আসেন বলে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে যায়। যেদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়, সেদিন কোন এক অজানা ভয়ে বুকের ভিতরে হাহাকার করে উঠে, নাকের কাছে হাতটা নিয়ে দেখি নিঃশ্বাস আছে কি না।

তবুও স্বপ্ন দেখি আমাদের সবার আদরের তুহিন একদিন সুস্থ হয়ে যাবে, স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে, আর্ট কলেজে পড়াশোনা করবে। আল্লাহ আমাদের এই স্বপ্নপূরণ করবেন কিনা জানিনা। দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, আমার বাবা-মা, আমরা, আমার ছোট বোন ও "থ্যালাসেমিয়া" আমরা সবাই এক অন্যের পরিপূরক। "থ্যালাসেমিয়া" এখন আমাদের পরিবারের একজন, যে আমার ছোট বোনটির শরীরে অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্খিতভাবে বসবাস করছে আর প্রতিনিয়ত আমার ছোট বোনটিকে না ফেরার দেশে নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করছে। আল্লাহ আমার ছোট বোনটিকে সহ্য করার শক্তি দান করুন আর আমাদেরকেও।

মা

হুমায়ুন কবীর
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

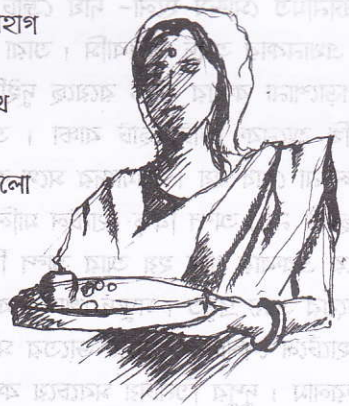

মা যে আমার আদর-সোহাগ
সাত রাজারি ধন,
'মা' যে আমার দুঃখ-সুখে
অতি আপনজন।
মা যে আমার দিনের আলো
রাতে চাঁদের বাতি,
মা যে আমার ভালোবাসা
দুই নয়নের জ্যোতি।
মায়ের মুখের হাসি যেন
চাঁদ তারারই হাসি,
ত্রিভুবনে তাইতো অধিক
মাকেই ভালোবাসি।
মা যে আমার আঁধার ভবে
পূর্ণ আলোর ধারা।
পদতলে বেহেশত তাই
হয়না মাকে ছাড়া।

স্বপ্নের ঘুম

মোঃ সফিকুল ইসলাম
অপারেটর, সুইং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

রাত হয়েছে ঘুম পেয়েছে
ঘুমিয়ে পড়ো সবে,
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে
স্বপ্নে রাজা হবে।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা
নয়তো এত সোজা,
স্বপ্নে তুমি রাজা হবে
পাবে ভারি মজা।

রাজা হবার স্বপ্ন দেখে
চমকে উঠে করলে তুমি একি?
তখন তুমি সব হারাবে
রাত এখনো বাকি।

স্বপ্নের দিনগুলি

সাঈদ আহমেদ
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

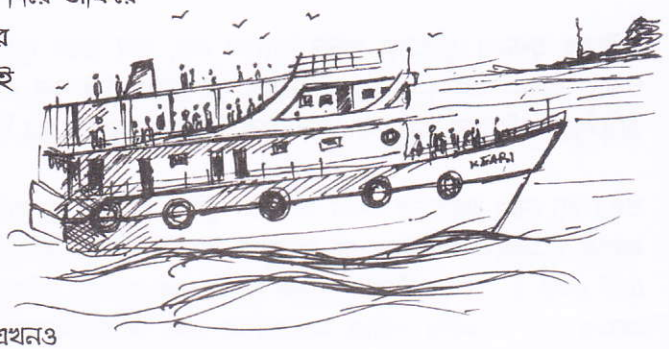

২০১২ সাল, ৯ জুন। সেন্টমার্টিন দ্বীপে আনন্দ ভ্রমণ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সূর্য অনেকটা উপরে উঠে গেছে। যতদুর চোখ যায় কাদার মাঠ। সূর্যের আলোয় সবকিছু চিকচিক করছে। যেদিকে তাকাই শুধু খাল আর খাল। অনুমান করলাম নাফ নদীর সঙ্গে এর যোগ আছে। জোয়ারের সময় এই সব খালে পানি আসে। দেখতে দেখতে অনেকটা পথ পেরিয়ে অদ্ভুত এক জায়গায় পৌঁছালাম। এক পাশে ঘন বন আর অন্য পাশে নদী। গাড়ি থেকে নামলাম। এবার টিকেট কেটে জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। টিকেট কেটে হাত মুখ ধুয়ে নিই। যাত্রা শুরুর এখনও ঘন্টা দেড়েক বাকি আছে। পাক্কা চৌদ্দ ঘন্টা গাড়িতে বসেছিলাম। কিছুটা হাঁটা যাক। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। কিছুদুর পর একটা ব্রিজ পার হই। রাস্তা বরাবর হাঁটছি। এক পর্যায়ে এসে দেখা গেলো জনমনুষ্যি নেই। সকাল দশটায় কেয়ারি সিন্দবাদে চড়ে যাত্রা শুরু করলাম। অনেকে হয়তো উপভোগ করছে নদী আর সাগর। কিন্তু আমার মন পড়ে রইলো প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর। খোলা নৌকায় গিজগিজ করছিলো অসংখ্য মানুষ। সিন্দবাদ শুধু চলতে থাকে। হঠাৎ দেখি এক ঝাঁক গাঙচিল আমাদের জাহাজের পিছু নিয়েছে। কোথা থেকে হাজির হলো কে জানে! যাত্রীরা চিপস্ আর বিস্কুট কিনে গাঙচিলের দিকে ছুড়ে মারছে। যারা খাবার কিনে দিচ্ছে তারা এখানকার বাসিন্দা। হঠাৎ দেখি এক ভদ্রমহিলার হাত থেকে খাবার খেয়ে যাচ্ছে গাঙচিলেরা। মানুষের মাঝে পক্ষীকুলের জন্য এই ভালোবাসা সাধুবাদযোগ্য। গাঙচিলের ওড়াউড়ি রীতিমতো রাজকীয়, সূক্ষ্ম নিয়ম মেনে চলা। এক সময় জলরাশির ভিতর থেকে মাথা তোলে সেন্টমার্টিন দ্বীপ। তীরের নীল জল দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মন বলে আমি তো এখানেই আসতে চেয়েছি। দ্বীপের মনুষ্যনির্মিত সৌন্দর্য হলো- দীর্ঘ জেটি ও মাছ ধরার নৌকা। হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগিয়ে দেখি হাটের মতো মানুষ। এরা সবাই এখানকার আদি অধিবাসি। তারা বেশীর ভাগ দিনমজুর। যারা ব্যবসা করছে তারা সবাই অন্য স্থান থেকে আসা। দ্বীপে পড়াশোনা করার জন্য রয়েছে দুইটি প্রাইমারী স্কুল, একটি মাদরাসা, একটি কিন্ডারগার্টেন ও একটি হাই স্কুল। তারপর দেখি অনেক ছোট ছোট বাচ্চা। তারা সারাদিন এই দ্বীপে পর্যটকদের পেছনে পেছনে ঘুরছে। তাদের বাড়ির লোক কিছুই বলে না বোধ হয়। আমাদের সঙ্গে আল আমিন নামে একটি ছেলে সারাদিন ছিলো। এই দ্বীপে মানুষেরা খুব যে বেশি সুখে আছে তা নয়, অল্প কিছু হোটেল মালিক ও বোট মালিক সুখে আছে। বড় সমস্যা হলো এই দ্বীপে ফসল কম হয়। সম্ভবত বছরে একবার ধান হয় আর অল্প কিছু সবজি। বাকি সব টেকনাফ থেকে আসে। দুপুর ১.০০টা। গোসল আর দুপুরের খাবারের জন্য প্রস্তুত। সমুদ্রে গোসল করা তো মজার ব্যাপার। সবাই মিলে সমুদ্রের পানিতে গোসল সেরে খাবার খাওয়ার একটি হোটেলে গেলাম। আমরা ভাতের সঙ্গে উড়ুক্কু মাছের অর্ডার দিলাম। ভাত, মাছ, ভাজি আর মাংস দিয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করলাম। দুপুর তিনটায় সবচেয়ে কমন অফার হলো- ছেঁড়া দ্বীপ ভ্রমণ। এভাবে কয়েকটা দ্বীপের কথা বলা হয়। শুনে মনে হবে এরা আলাদা দ্বীপ। আসলে আলাদা দ্বীপ না। জোয়ারে ছেঁড়া দ্বীপে কিছু অংশে পানি ওঠে। তবে একে আলাদা দ্বীপ বলা যায় না। মজার বিষয় হলো আপনি যদি হেঁটে ছেঁড়া দ্বীপে না যান তবে দ্বীপের নব্বই ভাগ সৌন্দর্য না দেখে ফিরে এলেন। আরো আছে অনেক দ্বীপ, তার মধ্যে মৌসুমি দ্বীপ অন্যতম। এখানে রয়েছে নানা ধরনের পাথরের সম্ভার। সৌন্দর্যের লীলাভূমির একটি বাহারি অংশ- যা বলে বোঝানো যাবেনা। মন শুধু পড়ে আছে ঐ দ্বীপগুলোর উপরে। এটা ভুলবার কথা নয়, বার বার মনে পড়ে- সেই স্বপ্নের দিনগুলোর কথা।

খোলপেটুয়া নদীতীরের মানুষগুলো

হাদিয়ার রহমান মীর
সিনিয়র ম্যানেজার, কমার্শিয়াল
ব্যাবিলন গ্রুপ

"খোলপেটুয়া" নামটা শ্রুতিমধুর না হলেও এর রূপের সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করেছিলো। এমন সুন্দর নদী অথচ নদীপারের মানুষগুলোর কি কঠিন জীবন! ২০১২ সালের ডিসেম্বরে অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্দেশ্যে আমরা গিয়েছিলাম সাতক্ষীরার শ্যামনগরে। আমরা মানে আমি, এইচ আর ম্যানেজার মাহমুদ সাহেব এবং আইটি ডিপার্টমেন্টের সাইফুল সাহেব। আজিজ ছিলো গাড়ি চালনার দায়িত্বে।

২০০৪ সালে এক ভয়াবহ উপকূলীয় ঝড় আইলার আঘাতে লন্ডভন্ড হয় সাতক্ষীরার উপকূল, সেই ক্ষত এখনো কাটেনি। আইলা বিধ্বস্ত মানুষগুলো এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি।

খোলপেটুয়া নদী তীরবর্তী পদ্মপুকুর, গাবুরা, মুন্সিগঞ্জ এবং নীলডুমুরে আমরা শীতবস্ত্র বিতরণ করি। ডিসেম্বরের ২১ এবং ২২ তারিখে আমাদের বিতরণ কাজ চলে। খোলপেটুয়া যতই সুন্দর হোক, তার লবনাক্ত পানি এ অঞ্চলের কৃষি জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী নয়। জোয়ার ভাটার কারণে জমিগুলোতে লবনাক্ত পানি ঢুকে ফসলের ক্ষতি করে। তবে এই লবনাক্ত পানি ব্যবহার করেই এ অঞ্চলের মানুষ চিংড়ি মাছের চাষ করে। কাঁকড়ার আবাদ, চিংড়ি চাষ করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশীক মুদ্রা অর্জন হয়। এই চিংড়ি ঘেরের মালিকানা সাধারণ মানুষের হাতে নেই। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। সাধারণ মানুষ কেউ ঘেরে কাজ করে, কেউ খোলপেটুয়ায় মাছ ধরে, কেউ সুন্দরবনের খালে, নদীতে, জংগলে বিভিন্ন উপায়ে কোনরকম জীবিকা নির্বাহ করে। জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বাঘ, কুমির, জলদস্যু, বনদস্যু এদের প্রতিপক্ষ- যাদের হাতে এরা প্রায়ই বিপন্ন হয়। ২০০৪ সালের আইলা তাদেরকে সর্বশান্ত করে গেছে। কেড়ে নিয়েছে আপনজন, ভেসে গেছে বাড়ি, লবনাক্ততায় নষ্ট হয়েছে সামান্য আবাদি জমিও।

আমরা এই মানুষগুলোর জন্য ব্যাবিলনের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করি। আমি লক্ষ্য করি আমাদের শীতবস্ত্র হাতে পেয়ে তাদের চোখে-মুখের আনন্দ। পদ্মপুকুরে শীতবস্ত্র বিতরণের সময় কতো অসহায় মুখ দেখেছি। বৈশাখী মন্ডল আট কিলোমিটার দুর থেকে বস্ত্র নিতে এসেছে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী বৈশাখী তার ঠাকুমা সিন্ধু মন্ডলের পক্ষে এসেছে। সিন্ধু মন্ডলের স্বামী তারাপদ মন্ডল আগের দিন মারা গেছেন বলে সিন্ধু মন্ডল আসতে পারেননি। ব্যাপারটা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এই অসহায় মানুষদের জন্য এই সামান্য সাহায্য কতোটা প্রয়োজনীয়।

সুন্দরবনের নিকটবর্তী গাবুরা এবং মুন্সিগঞ্জে শীতবস্ত্র বিতরণের সময়েও শত শত অসহায় মুখ চোখে পড়লো। চোখে পড়লো করুণতম অসহায় 'বাঘ বিধবাদের' শূন্য চাহনী। জীবিকার জন্য তাদের স্বামীরা সুন্দরবনে গিয়ে বাঘের আক্রমনে প্রাণ দিয়েছে। স্বামীহারা এই নারীদের স্থানীয় নাম বাঘ বিধবা।

দুই দিনের বস্ত্র বিতরণ শেষে আমরা ঢাকার পথে রওনা হলাম। উপকূলের অসহায় মানুষগুলো এবং বাঘ বিধবাদের করুণ চাহনী- আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

স্মৃতি

এ কে এম গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল
ব্যাবিলন গ্রুপ

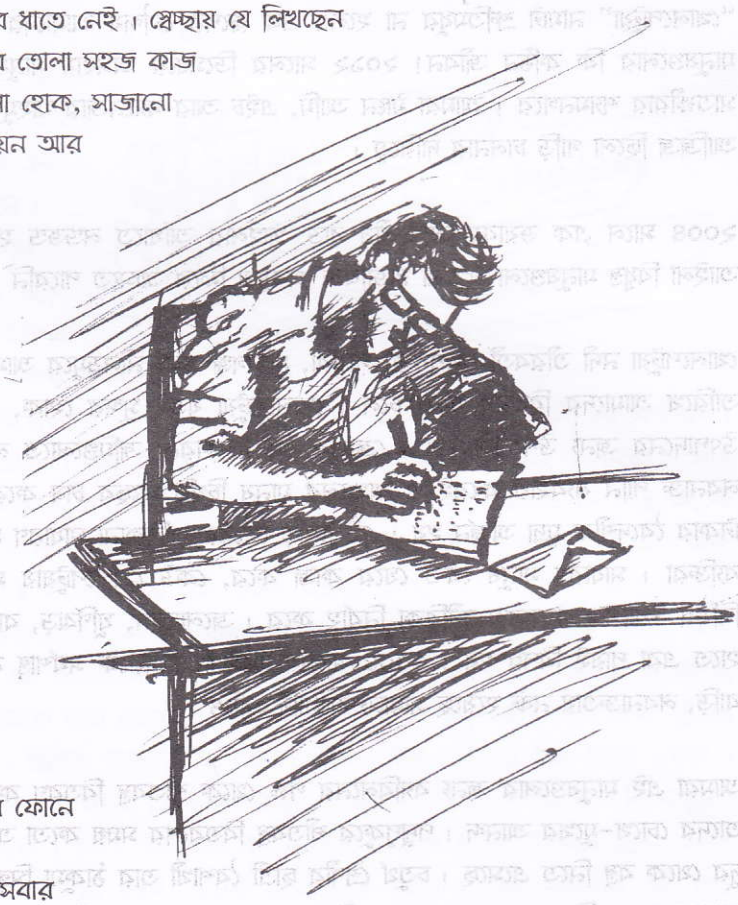

নিজামউদ্দিন সাহেব লিখতে বসেছেন। লেখালেখি তার ধাতে নেই। স্বেচ্ছায় যে লিখছেন তা নয়। ভালো লেখা এবং তা অন্যের পাঠযোগ্য করে তোলা সহজ কাজ না। দু'বেলা কলম খাতা নিয়ে বসতে হয়। এলোমেলো হোক, সাজানো হোক, কিছু না কিছু লিখতে হয়। গাইতে গাইতে গায়েন আর লিখতে লিখতে লেখক। কিন্তু তার সে সময় কোথায়? তাকে লিখতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। তার এলাকায় নতুন একটা সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশক তার এলাকারই এক ছোট ভাই। নাম- 'আরিফুজ্জামান এম,এ'। আজকাল মানুষের ডিগ্রিকে মানুষের নামের অংশ বানানোর জোর প্রচেষ্টা চলছে। আরিফুজ্জামান এম,এ নামটা সম্ভবত সে প্রচেষ্টারই ফল। যাই হোক, গত সপ্তাহে এলো সে নাছোড়বান্দার ফোন। নাছোড়বান্দা বলা হচ্ছে কারণ এই লোককে নিরস্ত করা অসম্ভব। ফোনে কোমল সুরে কথা বলে চললো আরিফুজ্জামান এম,এ -

হ্যালো নিজাম ভাই বলছেন?
জ্বি, আপনি?
আমাকে চিনলেন না ভাই, অথচ গত মাসেও আপনার ফোনে আমার নাম্বার সেভ করে দিয়েছি আমি নিজেই।
আসলে আমার ফোনটা হারিয়ে গেছে। নতুন ফোনে সবার নাম্বার এখনও তোলা হয়নি।
ও আচ্ছা, তাইতো বলি, তবে কি জানেন আমাদের মতো চুনোপুটিকে মনে না রাখলেও চলে স্যার। কার দিন ঠেকে থাকে আমাদের জন্য।
ভুল বললে আরিফ, কারও দিনই কারো জন্য ঠেকে থাকে না।
এই যে স্যার এখন চিনতে পেরেছেন। আমি ধন্য হয়ে গেলাম স্যার। আপনার মতো একজন বড় মাপের মানুষের কণ্ঠে আমার নাম শুনে।
আরিফ, তোমার স্বভাবটা বদলালো না। মনে হচ্ছে তুমি অয়েলিং থেরাপির পথ ধরেছো।
কি যে বলেন স্যার, আপনার ব্যাপারে আরো কিছু বললেও কম বলা হবে।
আমি বিরক্ত হচ্ছি আরিফ, কাজের কথায় আসো।
ঠিক বলেছেন স্যার, কাজের কথা, আমরা স্যার নিষ্কর্মা মানুষ, কাজ কম কথা বেশি, আপনারা.....
আমি ফোন রাখছি আরিফ।
সরি স্যার, কাজের কথায় আসা যাক। আপনি তো জানেন ভাই আমি একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন বের করার চেষ্টা তদবির করছি। লেখার যোগাড় করছি স্যার। তবে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। প্রথম সংখ্যায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লেখা নিয়ে একটা বড় অংশ রাখবো। গল্পের শেষে আমাদের সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকার জন্য তাদের মতামত ও

শুভকামনা। আইডিয়াটা কেমন স্যার?
বেশ ভালো, তো আমি কি করবো, লেখা দেবো?
একজ্যাক্টলী স্যার, আপনার মতো একজন সুপরিচিত ব্যক্তির একটা লেখা নিঃসন্দেহে আমার পত্রিকার কাটতি বাড়িয়ে দেবে।
দেখো আরিফ, আমিতো লেখালেখিতে অভ্যস্ত নই। আমাকে শুধু শুধু টেনো না এর মধ্যে।
স্যার, আর যাই করেন আমাকে ফেরাবেন না স্যার। আপনি যা খুশি লেখেন আমার এডিটরকে দিয়ে এডিট করাবো। আপনার সুনামে কোন ছেদ পড়বে না স্যার।
কিন্তু আমি তো...
আপনি চেষ্টা করলে পারবেন স্যার, প্লিজ্ আমাকে ডিজঅ্যাপয়েন্ট করবেন না।

অগত্যা বাধ্য হয়ে কথা দিলেন নিজামউদ্দিন সাহেব যে কিছু একটা লিখে দিবেন তা যৎসামান্যই হোক না কেন। তারই রেশ ধরে তার এই লিখতে বসা। কিন্তু মনে কোন প্লট তিনি দাঁড় করাতে পারলেন না। একবার মনে হলো একটা প্রেমের গল্প লিখবেন। পরক্ষণেই মনে হলো তার চল্লিশোর্ধ বয়সে প্রেমের গল্প লিখতে গিয়ে হয়তো প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে হাস্যকর করে ফেলবেন। আবার একবার মনে হলো একটা ডিটেকটিভ গল্প লিখবেন। বানানো না, একদম তার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

ছোট বেলায় একটা ডিটেকটিভ দল বানিয়েছিলেন। এক কোরবানীর ঈদে তাদের এক প্রতিবেশীর গরু চুরি হয়ে গেলো। তাদের ডিটেকটিভ দল দারুণ সাহসিকতার সাথে চোর খুঁজে বের করলো। গল্পটা জমে যেতো লিখতে পারলে, কিন্তু কয়েক লাইন লেখার পর মনে হলো তার এ মজার শৈশব স্মৃতিকে তিনি পাঠকের কাছে অখাদ্য করে পরিবেশন করছেন, ব্যস থেমে গেলেন।

ঘড়ির দিকে তাকালেন নিজামউদ্দিন সাহেব। রাত প্রায় পৌনে বারটা। তার স্ত্রী হেলেন বিছানায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার পাশে তার মেয়ে। ক'দিন ধরে তন্নীর এক অদ্ভুত অভ্যাস হয়েছে, সে তার মার সাথে ঘুমাবে। টিনএজ ছেলেমেয়েরা নাকি বড়দের থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে। তন্নীর বয়স তের। হিসেব মতো তার উচিৎ নিজের বেডরুমে ঘুমানো এবং মা বাবার সাথে ঘুমাতে অস্বস্তি বোধ করা। অথচ সে তার মার সাথে ঘুমাবে দু'বছরের ছোট্ট খুকির মতো।

গভীর রাত এক অদ্ভুত সময়। নির্বাকও সবাক হয়ে যায় এ সময়। তার বাঁ পাশের দেয়ালে যে দেয়াল ঘড়িটা আছে, দিনে তার সাড়া শব্দ পাওয়া যায়না অথচ এখন যেন সে প্রায় চিৎকার করছে। মানুষ যে বেঁচে আছে তার অনুভূতি নাকি সে স্পষ্ট বুঝতে পায় গভীর রাতে যখন নিস্তব্ধতার মাঝে নিজ হৃদস্পন্দন নিজেই শুনতে পায়। হৃদপিন্ডটা ছন্দোবদ্ধভাবে বলে যায়, 'আছি, আছি, আছি...। লেখালেখির জন্য রাতই ভালো সময় অথচ তিনি হাজার চেষ্টা করেও কিছু লিখতে পারছেন না। হঠাৎ তার মনে হলো, এত কষ্ট করে কি লাভ, তার সংগ্রহেতো কিছু পুরানো বই আছে, সেগুলো থেকে একটা গল্প খানিকটা কপি করে' খানিকটা নিজে লিখে একটা 'রাইট আপ' দাঁড় করানো যায়। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

তিনি নিঃশব্দে স্টোর রুমে গেলেন। হেলেন আর তন্নীর ঘুমে ব্যাঘাত হোক তা তিনি চান না। স্টোর রুমের ভেতরে একটা কোণায় একটা পুরাতন সুটকেস। তারই ভেতর বেশকিছু বইপত্র আছে। অনেক কষ্ট করে সুটকেস বের করে আনলেন তিনি। টেনে সেটাকে করিডোর পর্যন্ত আনলেন। সেখানে একটা চেয়ার এনে বসলেন কোন লেখাটা বাছাই করা যায় তা খুঁজতে। তার বয়স যখন চব্বিশ কি পঁচিশ তখন তিনি একটা উপন্যাস পড়েছিলেন। 'চিতা বহ্নিমান' ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এর লেখা। বইটা মনে দাগ কেটেছিলো। এই বইটা সুটকেস খুলতেই সামনে পড়লো। হঠাৎ কেন জানি বিশ বছর আগের পুরোনো একটা চেনা অনুভূতি তাকে ধাক্কা দিলো। তার ছকে বাধা জীবন এখন ট্রেন লাইনের মতো। লাইন ছেড়ে কোথাও যাবার ফুরসত নেই। এরই মাঝে পুরোনো সময় তার কাছে কেন ফেরত আসতে শুরু করছে বুঝতে পারলেন না। আরো দু'একটা বই সরাতেই চোখে পড়লো দু'টা পুরাতন ডায়রী, ধুলো ময়লা পড়া, ছেঁড়া, মনে হয় ইঁদুর কেটেছে। হাতে নিতেই যেন অতীতের একটা জানালার কপাট খুলে গেলো। মনে পড়লো, ডাইরীগুলো কমপক্ষে বিশ বছর আগের। তার একটা স্বভাব ছিলো- প্রতিদিন এ ডায়রীতে কিছু না কিছু লেখা। ডায়রীটা খুলে পড়তে শুরু করলেন তিনি। অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন তিনি। ডায়রীর সব লেখা দিন পঙ্ক্তি অনুযায়ী লেখা। তারিখ-সময় খুব স্পষ্ট। লেখাগুলো সব তার মাকে

সম্বোধন করে লেখা। সবগুলো লেখা বিস্তারিত না পড়ে তিনি প্রধান কয়েকটা লেখা পড়ে গেলেন। যারা পড়ছেন তাদের সুবিধার জন্য লেখাগুলো তুলে ধরা হলো।

তারিখ ঃ ১১/০৭/৮৭ইং সময় ঃ ১১.০৫ পি,এম

মা, আজ থেকে এ ডায়রীটা লেখা শুরু করলাম। ডায়রীটা বিশ টাকা দিয়ে কিনলাম। আমি জানি তুমি কি ভাবছো। ভাবছো, যে ছেলে মায়ের চিকিৎসার জন্য একশ টাকা পাঠাতে পারে না তার কি উচিৎ বিশ টাকা দিয়ে ডায়রী কেনা। উচিত না, তবু কিনলাম। এ ডায়রীতে সবার কথা লিখবো আমি। তোমার কথা, আমার কথা, তোমার আর ছেলেমেয়েদের কথা মানে আমার ভাইবোনদের কথা। তবে ডাইরীটা আমি তোমাকে দেখাবো না। দেখালে তুমি মনে মনে রাগ করবে। আমি জানি তোমাকে বাড়িতে রেখে এখানে এসেছি আজ প্রায় দু'মাস হতে চললো। কাজ বা চাকরি কিছুর ব্যবস্থা এখনও করতে পারিনি। চাচার বাসায় কিভাবে আমার দিনগুলো কাটছে তা তোমাকে বলে বোঝানো যাবে না। বাপহারা এতিম ভাতিজাকে চাচা খুব যত্ন-আত্তি করছেন। কেমন যত্ন-আত্তি করছেন তার একটা উদাহরণ দেই। গতকাল রাতে আমি খেতে বসেছি। সারাদিন একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে যখন বাসায় ফিরি খুব ক্লান্ত লাগে, গতকালও লাগছিলো, তখনই চাচা এসে বললেন-

কিরে, তোর চাকরি বাকরী কিছু হলো?
আমি বললাম, 'হয়নি, তবে হয়ে যাবে'।
চাচা বললেন, 'কবে আর হবে, সারাদিন টই টই করে ঘুরলে কি চাকরি হয়? চাকরি তো আর ছেলের হাতের মোয়া না।'
আমি চুপ রইলাম।
চাচা বললেন, 'দেখো, শহরে একটা মানুষ পোষার অনেক খরচ। একটা চাকরি যোগাড় করে নিজের পথ নিজে দেখো। আমি আর পারছিনা।'

আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। আজ দু'দিন ধরে একটা টিউশনি পেয়েছি। মাসে পঞ্চাশ টাকা। এ লেখাগুলো যদি তুমি পড়তে সত্যি তোমার মন খারাপ হয়ে যেতো, তাই না মা? নিজের অসুস্থতার কষ্টের চেয়ে আমার কষ্টটা তোমাকে বেশি কাঁদাতে শুরু করতো, তাইতো খুব গোপনে লিখছি যাতে তুমি না দেখো।

তারিখ ঃ ২১/০৯/৮৭ইং সময় ঃ ১০.৩০ পি,এম

আজ দিনটা আমার জন্য খুব খুশির দিন মা। একটা ছোট খাট চাকরি পেয়েছি। তেমন কিছু না। বেতন খুব সামান্য। কিছু অ্যাডভান্সও পেয়েছি। বেতন চারশ টাকা, অ্যাডভান্স পেয়েছি দু'শ, তা তোমাকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলাম। দয়া করে এবার নিজের চিকিৎসাটা করাও। নগেন ডাক্তারকে বলো ঠিকমতো দাওয়াই দিতে। কি যে চিকিৎসা করে লোকটা। ওর ঔষধের দোকানের সামনে একটা হাতুড়ি ঝুলিয়ে দেয়া উচিৎ। দোকানের নাম 'নগেন চিকিৎসালয়' বাদ দিয়ে লেখা উচিৎ 'হাতুড়ি চিকিৎসালয়'। কবির আর রেহানা ঠিকমতো পড়াশুনা করে কি না কে জানে। তুমি একটু খেয়াল রেখো ওরা ঠিকমতো স্কুলে যায় কিনা। আমি একটা সরকারী কলেজে ভর্তি হবো ভাবছি। ইন্টারমিডিয়েট আজকাল কোন ডিগ্রি না। কমসে কম ডিগ্রি পাস হওয়া চাই। চাকরিতে কয়েক মাস টিকে গেলে বেতন হয়তো বাড়বে। আশা করি এখন থেকে নিয়মিত কিছু করে টাকা পাঠাতে পারবো। আমায় দোয়া করো মা।

তারিখ ঃ ২৯/০৯/৮৭ইং সময় ঃ ৯.৩০ পি,এম

মা, গত সপ্তাহে যে চিঠিটা পাঠিয়েছি তার জবাব এখনও পেলাম না। খুব দুশ্চিন্তা লাগছে। গতকাল চাচার বাসা থেকে একটা মেসে উঠে গেছি। খুব হাল্কা লাগছে। ছোটকালে বাবার সাথে যখন ফসলের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরতাম, তখন নিজের কষ্টটা বুঝেছি, কিন্তু বোঝাও যে কাঁধে চড়ে কষ্টে থাকে তা বুঝিনি। এ ক'দিনে বোঝার না বলা কষ্টটা বুঝেছি অন্যের কাঁধে বোঝা হয়ে। মাগো, তুমি কী এখনও বাবার কবরটার পাশে বসে থাকো? একটা অভ্যেস গড়েছো বটে। সকাল সন্ধ্যা একটা কবরের পাশে চুপচাপ বসে থাকার কী মানে বুঝি না। তবে, তুমি অসাধ্য সাধন করেছো। সমাজের নিয়ম হলো, যে মানুষ হারিয়ে যায় তাকে হারাতে দেয়া। ভুলে যাওয়া তাকে। তুমি বাবাকে হারাতে দাওনি, না তোমার কাছে না আমাদের কাছে। এমন কি একটা সকাল গেছে যেদিন বাবার কবরের জংলাগুলো ছেঁটে দাওনি? এমন কী একটা চিঠি পেয়েছি যাতে দু'একবার বাবার প্রসঙ্গ আসেনি? কীভাবে পারো মা এত ভালোবাসতে? গত চিঠিতে লিখেছিলে, তোমার জন্য চিন্তা না করতে, তুমি ভালো

আছ। শুনে মনে হয়েছিলো অনেক দিন পর একটা পুরো রাত শান্তিতে ঘুমাতে পারবো। চোখের নিচে স্থায়ী হয়ে যাওয়া কালো রংটা একটু হলেও যুচবে। তোমাকে আজ একটা কঠিন কথা বলে শেষ করবো মা। মুখোমুখি কোনদিন এ কথা তোমাকে বলতে পারবো না তাই ডায়রীতে লিখে বলছি। বাবাকে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে দাও মা। যে মানুষটা তোমাকে তোমার সন্তানদেরকে নিয়ে ভাবেনি, কেন তাকে মনে রাখো। এমন স্বার্থপর উদার মানুষকে ভুলে যাওয়া উচিৎ। যদি বাবা ছোট চাচার প্রতি উদারতা দেখাতে গিয়ে নিজের সম্পত্তির অংশ ছেড়ে না দিতেন তাহলে আজ আমাদের কী এমন অবস্থা হতো? তুমি কিভাবে মেনে নিয়েছিলে বাবার এমন সিদ্ধান্ত? হয়তো ভেবেছিলে, 'সব যাক, বাবা তো তোমার পাশে থাকলো' কিন্তু দেখো বাবাও চলে গেল তোমাকে একা করে। আর যাকে সব দিয়ে গেলো উজাড় করে তার ঘরেই আমি এতদিন ছিলাম, অতিথি হয়ে নয়.. মা... প্রেফ বোঝা হয়ে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে মা। আজ শেষ করছি।

তারিখ ঃ ২৩/১০/৮৭ইং সময় ঃ ১২.৩০ এ,এম

এ ক'দিন তোমাকে লিখতে পারিনি মা, গতমাসে তোমাকে একটা মানি অর্ডার পাঠিয়েছি, কিন্তু কোন চিঠি দেইনি। নিশ্চয়ই রাগ করেছো মা? কী যে কাজ পড়েছে মা, সারাদিন শুধু কাজ কাজ আর কাজ। এর ফাঁকে যে তোমাকে দু'কলম লিখবো সে সময় করে উঠতে পারিনি। কাল খুব সকালে উঠতে হবে। তাই ঘুমাতে হবে এখন। আমি খুব শীঘ্রই বাড়ি আসবো মা। তুমি রাগ করোনা, কেমন?

তারিখ ঃ ৩০/১১/৮৭ইং সময় ঃ ১০.৫৫ পি,এম

মা, একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেছে আমার জীবনে। তোমাকে চিঠিতে কখনও ভনিতা করে কিছু লিখি না। এখানেও লিখবো না। অভূতপূর্ব ঘটনা হলো, আমি বিদেশ চলে যাচ্ছি। সৌদি আরব। আমাদের কোম্পানীর সাথে একটা কোরিয়ান কোম্পানীর চুক্তি হয়েছে। তারা আমাদের কোম্পানী থেকে বেশ কিছু শ্রমিক তাদের সৌদি আরবের কারখানায় নিচ্ছে। সেই লিষ্টে আমার নাম থাকার কথা না, কারণ আমি এখনো পার্মানেন্ট এমপ্লয়ী হইনি। তবু সেই লিষ্টে আমার নাম ৯ নাম্বারে। এটাকে কি সৌভাগ্য বলবো, না অন্যকিছু বুঝতে পারছি না। উত্তেজনায় গত কয়েক রাত ঘুমাতে পারিনি। কেবলই হাজারো স্বপ্ন এসে চোখে ভীড় করে। আমাদের হাভাতে অবস্থাটা এবার বদলাবে তো মা? কেন জানিনা জোর করে স্বপ্ন দেখা থামাই। স্বপ্ন একটা বেলুনের মতো তা কালেভদ্রে সত্য হয়ে যায়। মাটির মানুষকে কখনও কখনও আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আবার কখনও সেই স্বপ্নের বেলুন ফুটো হয়ে যায়। তখন শূন্যতা ছাড়া কিছু থাকে না। গত শুক্রবার তোমার কোল ছেড়ে ঢাকা আসলাম। এবার বাড়িতে আরও একটা দিন বেশি থাকার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু ছুটি কম, এত কম যে মনে হলো যেন দম নিয়েছি কিন্তু দম ছাড়তে পারিনি। তুমি বাড়িটাকে এবার খুব সুন্দর করে ফেলেছো। বাড়ির সামনের দরজায় যে কাঁঠাল চারা লাগিয়েছো তা এত দ্রুত বড় হচ্ছে কীভাবে! আমাদের বরই গাছটাও তো অনেক বড় হয়েছে, বরইগুলোও খুব মিষ্টি। গত বছরতো এত মিষ্টি ছিলোনা, এবার এর গোড়ায় চিনি দিয়েছো নাকি? তুমি এবার বললে, রেহানার নাকি বিয়ের প্রস্তাব আসছে। আমিতো হতবাক। এতটুকু মেয়ের আবার বিয়ে। আচ্ছা রেহানা আমাকে কি ভয় পেতে শুরু করেছে? এবার দেখলাম কেমন যেন দুরে দুরে থাকে। দুরে থাকার কারণে কি আমি তোমাদের পর হতে শুরু করেছি মা? লেখা শেষ করার আগে তোমাকে একটা অনুরোধ করবো। জানিনা এ অনুরোধ মুখোমুখি আমি কখনও তোমাকে করতে পারবো কি না। করলেও তুমি অনুরোধটা রাখতে পারবে না। মা, আমি যখন বাড়ি ছেড়ে ঢাকায় রওয়ানা হই তখন তুমি বার বাড়ির উঠানে মাদার গাছটার সাথে মাথা ঠেস দিয়ে এভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না। এভাবে তোমাকে রেখে আসতে আমার খুব কষ্ট হয়।

তারিখ ঃ ১১/১২/৮৭ইং সময় ঃ ৩.১১ এ,এম

মা, কাল আমার ফ্লাইট। কেমন করে এত সব হলো কিছুই বোঝাতে পারবো না। মেডিকেল চেক আপের সময় ভেবেছিলাম আটকে যাবো। হয়তো কোন অসুখ খুঁজে পাবে আমার মাঝে। ভেস্তে যাবে সব। এমনটা হয়নি। ঐ দেশে যেতে প্রায় বিশ হাজার টাকা লাগছে। সেখানে গিয়ে কোথায় কাজ করবো কিভাবে থাকবো, কিছুই জানিনা। শুধু জানি, আমার বেতন থেকে মাসে মাসে টাকা কেটে নিয়ে এই বিশ হাজার পুষিয়ে নেয়া হবে। আমার জন্য দোয়া করো মা। তোমাকে বিদেশ যাওয়ার আগে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে। গত কয়েকদিন থেকে তোমার চেহারাটা মনে আনতে পারছি না। আসলে আমি ভেবে বের করেছি, আমরা কখনই আমাদের খুব কাছের মানুষগুলোর মুখ মনে রাখতে পারি না। ভুলে যাই। সবচে' বেশি ভুলে যাই নিজের মুখ, তাই বারবার আয়না দেখে মনে করতে হয়। তোমার মুখটা একবার পুরোপুরি মনে করতে পারলে শান্তি লাগতো। হঠাৎ চলে যাচ্ছি বলে মন খারাপ করো না মা, কেমন।

তারিখ ঃ ১৫/১২/৮৭ইং সময় ঃ ৮.১৭ পি,এম

সৌদি আরব এসে পৌঁছেছি মা দু'দিন আগে, দু'দন্ড অবসর নেই । কেবলই দৌড়াচ্ছি নানা কাজে । গতকাল থেকে আমাদের চাকরি শুরু হয়েছে । কাজ তেমন কঠিন কিছুনা । যে হোটেলটায় আমাদের রাখা হয়েছে, তা অনেক বড় আর সুন্দর । হোটেলটার নাম 'রয়েল কমিশনার হোটেল' আমাদের হোটেলটা মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি এলাকায় । এখানে চারটা বড় বড় তেলের খনি আছে । এলাকার নাম 'ইয়ানবো'। এখানে অনেককিছু মানিয়ে নিতে হবে । সবচে' বেশি মানিয়ে নিতে হবে একা থাকা । খুব ক্লান্ত লাগছে মা । ঘুম আসছে দু'চোখের পাতা ভারী করে । তুমি ভালো থেকো মা ।

তারিখ ঃ ১৫/০৩/৮৮ইং সময় ঃ ১১.০৫ পি,এম

আজ সৌদিতে আসার তিন মাস পূর্ণ হলো । এই দীর্ঘ সময়ে তোমাকে দু'টো চিঠি দিয়েছি । একটার জবাব পেয়েছি । একটার পাইনি । চিঠি পাঠিও মা । এখানে একটা চিঠি যে কী তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না । এখানে সবাই খুব একা । আপনজন থেকে অনেক দুরে । ইচ্ছে করলেই কাউকে কাছে পায় না । সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে একটা চিঠির জন্য । যাদের কাছে চিঠি আসে তারা কি যে খুশি হয় । যাদের কাছে চিঠি আসে না, তাদের মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি কেউ নেই তাদের । আমি একটা সাইকেল পেয়েছি কোম্পানী থেকে । ছুটির দিন সাইকেলে চড়ে লোহিত সাগরের তীরে চলে যাই । সাগরের তীরে কী যে ভালো লাগে মা বলে বোঝাতে পারবো না । মা আমি কাজে কর্মে বেশ দক্ষ হয়ে গেছি । মনে হয় সুপারভাইজর পদে উঠে যাবো । এমনটাই কথা শুনলাম । তুমি দোআ করো মা ।

রুদ্ধশ্বাসে ডায়রী পড়ে যাচ্ছিলেন নিজামউদ্দিন সাহেব । এখানে এসে দম নিলেন । অতীত মানুষের সাথে কথা বলে । তার সাথেও বলছে । ডায়রীর পরের লেখাগুলো অনেকদিন পর পর লেখা । কয়েকটা লেখা খুব সংক্ষিপ্ত ।

তারিখ ঃ ৮/০৬/৮৮ইং সময় ঃ ৮.১৮ পি,এম

মা, রেহানার বিয়ে দিয়ে দিলে, আমাকে একবার জানালেও না । বেশ করেছো । আমি তো দুরে থাকি । আমি কে?

তারিখ ঃ ১৮/০৯/৮৮ইং সময় ঃ ৮.৫৭ পি,এম

মা, টাকা পেয়েছো শুনে নিশ্চিন্ত হলাম । টাকা পাঠানোর অনেক ঝক্‌কি । বাড়তি টাকা জমিয়ে কবিরকে একটা দোকান নিয়ে বসিয়ে দাও । শুধু গায়ে বাতাস লাগিয়ে ফিরলে হবে?

তারিখ ঃ ৫/১২/৮৮ইং সময় ঃ ৮.৪৫ পি,এম

মা আজ আমি আশায় ছিলাম তোমার চিঠি পাবো । কোথায় চিঠি । আমি খুব হতাশ বোধ করছি । তুমি কি অসুস্থ মা?

তারিখ ঃ ৭/০৫/৮৯ইং সময় ঃ ৯.১৩ পি,এম

মা, আজ চিঠি পেলাম, তবে তোমার না কবিরের । লিখেছে, তুমি খুব অসুস্থ । সম্ভব হলে যেন দ্রুত দেশে আসি । তুমি কী এমন অসুস্থ মা যে আমাকে দেশে আসতে হবে? আমার হাত কাঁপছে মা । লেখা আঁকা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে । আমি কোম্পানীর কাছে ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি । ওরা বললো, পাঠালে একবারে পাঠিয়ে দেবে । একবার পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে আনার ঝক্‌কি ওরা নেবে না । আমি চলে আসবো মা । তুমি চিন্তা করো না । আগামী মাসেই আসবো । মায়ের চেয়ে চাকরি বড় না । কবিরকে আমি চিঠিতে লিখেছি যেন তোমাকে ঢাকায় নিয়ে ভালো ডাক্তার দেখায় । আল্লাহ ভরসা ।

এবার ডায়রীর শেষ লেখাটায় পৌঁছে গেলেন নিজাম সাহেব । এ লেখাটা লাল কালিতে লেখা । আগের লেখাটার একুশ দিন পর লেখা । পড়তে শুরু করার আগে বড় একটা নিঃশ্বাস নিলেন তিনি । মানসিক চাপে হার্ট বেশি বিট করে । অক্সিজেন বেশি বার্ণ হয় । বড় নিঃশ্বাস সে অক্সিজেনের অভাব পূরণ করে ।

তারিখ ঃ ২৯/০৫/৮৯ইং সময় ঃ ৩.১৯ এ,এম

মা, তুমি কোথায় আছ জানি না । আগে যখন লিখতে বসতাম মনে একটা ছবি ভেসে উঠতো । তুমি আমাদের কালো রঙের জমিদারী পালংকের ওপর বসে আনমনে কাঁথা সেলাই করছো আর আমি পালংকের কার্নিশে ঠেস দিয়ে তোমার সাথে কথা

বলছি। তোমাকে সামনে রেখে আমি লিখতাম। আজ যখন লিখছি, তখন জানিনা তুমি কোথায়। শুধু জানি তোমার মৃতদেহ বাবার কবরের পাশে দাফন হয়েছে আরো দশদিন আগে। আমি সে খবর পেলাম আজ। অথচ দেখো মা আগামী পরশু আমার চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়ার কথা, পাঁচ দিন পর ফ্লাইট। মা, কেন এমন হলো? তোমাকে শেষবারের জন্য দেখার ভাগ্য কেন আমার হলো না? আমি কেন এত অভাগা? বলো মা, বলো। তুমি অনেক অভিমান করে আছো তাই না? চোখ চিরদিনের জন্য বোজার আগে নিশ্চয়ই তোমার অভাগা ছেলেটাকে একবার দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে। তোমার অতৃপ্ত ইচ্ছা নিয়ে তো তুমি চলে গেছ। তোমাকে যে শেষবার দেখা হলো না সেই দুঃখ নিয়ে আমি কিভাবে বাকীটা জীবন বেঁচে থাকবো বলো মা? কীভাবে বেঁচে থাকবো? আজকের পর থেকে আর লিখবো না ডায়রী। যাকে লেখা সেই তুমিই ফাঁকি দিয়ে চলে গেছো, তাই খুব অভিমান হচ্ছে। তুমি ভালো থেকো মা।

নিজাম সাহেবের চোখ ঝাপসা হয়ে আসলো। তিনি কি কাঁদছেন? তা বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো এতদিনে অশ্রু লুকাতে শিখেছেন তিনি। ঘড়িটার দিকে তাকালেন। রাত প্রায় সাড়ে তিনটা। ফোন হাতে নিয়ে ফোনবুক থেকে আরিফুজ্জামানের ফোন নাম্বারটা বের করলেন তিনি। দ্বিতীয়বারের সময় কল রিসিভ হলো। ওপাশ থেকে ঘুমজড়ানো কণ্ঠে কথা বলে উঠলেন আরিফুজ্জামান।

হ্যা লো, স্যা র।
আরিফ, আমি লিখতে পারিনি কিছুই। তবে আমার পার্সোনাল ডায়রীতে অতীতের কিছু ঘটনা আছে। ওগুলো হলে চলবে?
চলবে স্যার, অবশ্যই চলবে। আমি আগামীকাল এসে নিয়ে যাবো স্যার।
তোমাকে আসতে হবে না। আমিই আসবো তোমার ছাপাখানায়।
অবশ্যই আসবেন স্যার। অবশ্যই আসবেন।

ফোন রেখে নিজাম সাহেব স্টাডি টেবিলে কলম আর ডায়রীটা নিয়ে বসলেন। ডায়রীর সর্বশেষ লেখাটা শুরু করলেন তিনি।

তারিখ ঃ ১৮/১১/২০১০ইং সময় ঃ ২.১৩ এ,এম
মা, মনে পড়ে, আমি তোমাকে বলেছিলাম... বাবাকে তুমি কখনও আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে দাওনি। অথচ তোমাকে আমার জীবন থেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তোমাকে শেষবার যেদিন এ ডায়রীতে লিখেছি তার পরের দিন আমার রেজিগনেসন ক্যান্সেল করি। এর পরও আরো চার বছর সৌদিতে ছিলাম। চাকরির মেয়াদ শেষ করে দেশে ফিরেছি। ঢাকায় জমি কিনেছি। জমানো টাকা যা ছিল তা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছি। আজ পুরো শহরের ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আমি। নাম, যশ, প্রতিপত্তি সবই আছে। অথচ তুমি নেই। তোমার ছেলে কবির এখন একজন নাম করা উকিল। তোমার মেয়ে রেহানা স্বামী সংসার নিয়ে সুখে আছে। আমিও স্ত্রী কন্যা নিয়ে সুখী। ভুলে গিয়েছিলাম আমার বুকের ক্ষতটাকে। মনে হয়েছিলো ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে। ভেবে ভুল করেছি। তোমাকে হারানোর ক্ষতটা এখনো হৃদয়ে টনটন করছে। তুমি ভালো আছো তো মা? বাবা ভালো তো?

পরিশিষ্ট ঃ ডায়রীটা পড়ে আরিফুজ্জামান এর চোখ ভিজে গেলো। কোমল কণ্ঠে বলল, ভাই... আপনি এত ভালো লেখেন! একশটা উপন্যাসও এতটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করতে পারে না। একদম খাঁটি লেখা।

সেদিন রাতে একটা নতুন ডায়রী আর কলম নিয়ে বসলেন নিজামউদ্দিন সাহেব। প্রায় মাঝরাত। তিনি লিখতে শুরু করলেন, মা.....।

ভাবনার অন্তরালে

মাহাবুবুর রহমান
ডেপুটি ম্যানেজার, ফিনিশিং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

প্রথম যেদিন ভূ-গোলক দেখেছিলাম সেদিন খুব অবাক হয়েছিলাম। এই গোলাকার পৃথিবীতে কতো শতো দেশ, কতো সাগর-মহাসাগর। আমি খুব বিস্ময়ের সাথে ঐ গোলাকার বস্তুটিতে আমার দেশটাকে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষে মনে হলো ভারতের পাশে খুঁজে দেখা যাক। অবশেষে খুঁজে পেলাম আমার মাতৃভূমিকে। ভাবতে লাগলাম পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের আয়তন এবং জনসংখ্যার কথা। কতো বিচিত্র এই পৃথিবী, ভূ-গোলকের দিকে না তাকালে হয়তো বুঝতেই পারতাম না।

আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশের বাসিন্দা আমরা। আধুনিক দুনিয়ার সকল সুযোগ-সুবিধা আমাদের না থাকলেও তিনবেলা খাওয়া, থাকা, ঘুমানো এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। আমরা যেমন প্রচন্ড পরিশ্রমী ঠিক তেমনি যে কোন উদ্যোগ গ্রহণের মানসিক শক্তি আমাদের রয়েছে। এ জন্যই অনাহারে মৃত্যুর খবর এখন আর কোন মিডিয়া অথবা পত্রিকায় দেখা যায় না অথবা শোনাও যায় না। অথচ আফ্রিকার দেশগুলোতে খাদ্যের অভাবে মানুষের মৃত্যুর খবর আমরা টেলিভিশনে দেখি, পত্রিকার মারফত জানতে পারি।

আমরা মোটামুটি ভালোই আছি। কিন্তু কিভাবে থাকবো, কতদিন থাকবো এগুলো নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। প্রথমেই বলতে চাই- এদেশ খাদ্যে কোনদিনই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো না। তাহলে আমরা কিভাবে ভালো আছি? অবশ্যই গার্মেন্টস শিল্পের কল্যানে। ৮০'র দশকে যে শিল্পের শুরু তার সংখ্যা এখন তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এই শিল্পে প্রত্যক্ষ কাজ করে অসংখ্য লোক। আর প্রায় বিশ লক্ষ লোক এর সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত। আমরা কি উদাসীন হতে পারি এই শিল্পের প্রতি?

কুরবানীর ঈদের ছুটিতে বাড়ীতে যাবো। বাসের টিকেট পাওয়া গেলো না। আমি আর আমার মামাতো ভাই জামালপুরের দুইটা টিকেট কিনলাম। ট্রেন ছাড়ার কথা পৌনে পাঁচটায়। সোয়া চারটায় আমরা স্টেশনে পৌঁছালাম। ট্রেনে উঠতে দেখি ভেতরে তিল ধারণের জায়গা নেই। মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি, কোন রকমে প্রায় বিশ মিনিটের চেষ্টায় আমাদের সিটে পৌঁছাতে পারলাম। ভ্যাপসা গরমে দম বন্ধ হয়ে আসছে, জানালার পাশে সিটে বসে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। আমাদের সিটটা ছিল তিনজনের আর গেটের পাশে। ট্রেন ছাড়লো নির্ধারিত সময়ের ঘন্টাখানেক পরে। পরের স্টেশনগুলোতে দেখলাম ট্রেন থামার সাথে সাথে কিছু লোক বাঁশের মই নিয়ে ট্রেনের ছাদে উঠার সিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছে। ঐ সিঁড়ি বেয়ে ছেলে মেয়ে সবাই ছাদে উঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। জন প্রতি দশ টাকা দিতে হচ্ছে মই এর মালিককে। ছাদে উঠা ছেলে মেয়েদের মধ্যে বেশীর ভাগই গার্মেন্টস শ্রমিক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনজনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। জীবনের প্রতি পদে পদে কষ্ট করতে হচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে। ট্রেন জয়দেবপুর স্টেশনে পৌঁছালে ট্রেনের অবস্থা দেখার জন্য নীচে নামলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম- কোন ছাদের কোথাও এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁকা নেই। তারপরেও বাঁশের মই বেয়ে ছেলেমেয়েগুলো ট্রেনের ছাদে উঠে যাচ্ছে। পরের স্টেশনে শ্রীপুরে আবার ট্রেন থামলো। দেখলাম এক মহিলা কোলে দুই বছরের ছোট্ট শিশু এবং ছয়-সাত বছরের একটি মেয়েসহ ট্রেনের লাইনের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দৌড়াচ্ছে। আমাদের বগির গেটের সামনে এসে বললো- বাবারে সকাল আটটা থেকে তিন-চারটা ট্রেন চলে গেলো কিন্তু কোন ট্রেনেই জায়গা পেলাম না। আমারে একটু উঠতে দ্যান বাবা, না হলে আর বাড়ী যাওয়া হবে না। মহিলার দুর্দশায় আমাদের মায়া হলো। ওনাদেরকে টেনে হিঁচড়ে ট্রেনে তুলে গেটের পাশে দাঁড় করালাম। বাচ্চাটাকে আমার কোলে নিয়ে বসে পড়লাম। এদিকে মানুষের চাপে আর ট্রেনের ঝাঁকিতে তার ছয়-সাত বছরের মেয়েটার অবস্থাও খারাপ। তাকেও আমার সিটের পাশে কোন রকমে বসতে দিলাম। স্রষ্টাকে স্মরণ করলাম- আল্লাহ সবাইকে তুমি ভালো রেখো। কথা প্রসঙ্গে জানা গেলো এই মহিলাও আমার মতো গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের কর্মী। ১৬০ কিলোমিটার পথ যেতে সাত ঘন্টা লাগলো। স্টেশনে নেমে আশ্চর্য হয়ে গেলাম- কতো হাজার মানুষ যে এই ছোট্ট ট্রেনের পেটের মধ্যে থেকে বের হলো তার কোন হিসাব নেই। প্রতি বছরই আমরা দেখি ঈদের সময়ে একটা নির্দিষ্ট দিনে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলো ছুটি দেয়া হয়। এতে করে বাড়ী ফেরত মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না। গাড়ী এবং রাস্তার উপরে একদিনেই সব চাপ পড়ে।

ছুটিটাকে যদি জোন ভিত্তিতে ভাগ করে বিভিন্ন দিনে দেয়া যেতো, তাহলে মানুষের ভোগান্তি হয়তো কিছুটা কমতো। সংশ্লিষ্ট সকলে বিষয়টা ভেবে দেখতে পারেন। সরকার পারেন ট্রেন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে। ঈদের সময় বাড়তি ভাড়া আদায় বন্ধ করতে।

যে শিল্পে নিরলস শ্রম দিয়ে এই সব মানুষেরা দেশকে শক্তিশালী এবং অর্থনীতিকে মজবুত করে চলেছে তাদের জন্য আলাদাভাবে কিছু করার কথা মালিকেরা ভাবতে পারেন। সরকারও পারেন। এটা তাদের প্রাপ্য। ন্যায্য প্রাপ্য।

প্রাইস অফ মিটার

মোঃ শাহিনুর ইসলাম
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

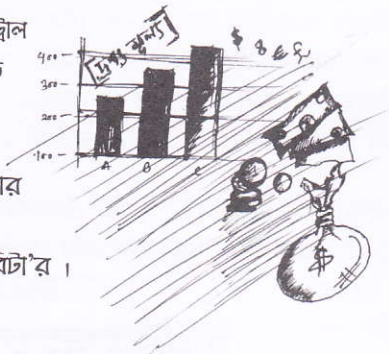

বাড়ছে দামের মিটার
বাড়ীর ভাড়া, পানির লিটার
চুন-সুপারি, জমি-ভিটার
খাট পালঙ আর আলমারিটা'র।

বাড়ছে দামের মিটার
কাঁচামাল আর শ্রমের বাজার
দুধ, চিনি, চা, কাঁচাবাজার
কাগজ, কলম, পেন্সিল, রাবার।

বাড়ছে দামের মিটার
বাড়ছে চালের, বাড়ছে চিটার
সিমেন্ট লোহা পাথর ইটার
টিভি, ফ্রিজ, এসি, হিটার।

বাড়ছে দামের মিটার
গ্যাস, বিদ্যুৎ, খেলনা-গিটার
টিউশন ফি, বাসের সিট আর
আগের ভাড়া নাইরে ভাই আর।

বাংলা তুমি আমার ভূমি

জেসি খাতুন
সহকারী অপারেটর, সুইং
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

বাংলা তুমি আমার ভূমি
রূপের নাইতো শেষ,
সেই রূপেতে মরিয়া আমি
আমার বাংলাদেশ।
ও তোমার রূপের নাইকো শেষ,
আমার সোনার বাংলাদেশ।

গাছে গাছে পাখি ডাকে
পাতায় পাতায় শিশির,
মাঠে মাঠে ধানের ছড়া
আনন্দ নিবিড়।
ও তোমার রূপের নাইকো শেষ
আমার সোনার বাংলাদেশ।

নদ-নদী বয়ে গেছে গ্রাম বাংলার উপর,
তোমার এই রূপ যেন
প্রচন্ড প্রখর।
ও তোমার রূপের নাইকো শেষ
আমার বাংলাদেশ।
রোজ ভোরেতে আম কুড়াতে
মজার নাইকো শেষ
আমার সোনার বাংলাদেশ।

গাছে গাছে ফুলের ছড়া
ডালে ডালে পাখি,
তোমার রূপে জুড়ায় আমার
মধুময় আঁখি।
ও তোমার রূপের নাইকো শেষ
আমার সোনার বাংলাদেশ।

যশোহর ও আমি

আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ
ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বহুদিন থেকে ভাবছি, ভাবতে বসবো । অথচ এক দন্ড অবসর মেলে না । নিজের জীবনকে গুছিয়ে নেয়ার জন্য যে জীবন যুদ্ধ, সেখানে হিসাবের খাতায় সময়ের উপর দখল অন্যের, নিজস্ব বলতে কেবল ঘুম নামক অচেতনতায় অবচেতন মনের অবাধ বিচরণ । কখনো কখনো সেই বিচরণকেই জীবন ভেবে জীবনটাকে প্রকট ভালোবেসে ফেলি । আর তাই দেখে মুচকি হাসেন ফ্রয়েড নামক জনৈক ভদ্রলোক । সোলায়মানী খাবনামায় জমে ওঠে ধুলোর আস্তরণ ।

যশোহরে ফিরে যাবো বলেই একদিন যশোহর ছেড়েছিলাম । আজও ফেরা হয়নি....
কালেক্টরেট বিল্ডিংয়ের সামনের কৃষ্ণচূড়াগুলো আজও আগুন লাগিয়ে দেয় বলে শুনি, শুধু সে আগুনে পোড়ে না আমার অস্তিত্ব । এখন কেবল আগুন দেখি ফিলিপ মরিসের পণ্যে, সে আগুন বেণি মাধবের হৃদয়ে হানে ব্যর্থ টংকার ।

মনে পড়ে, পড়ন্ত বিকালে শ্রান্ত শরীরকে আরও শ্রান্ত করে আরবপুর পার হয়ে উঠে পড়তাম রেললাইনে । প্রেমে নিবিষ্ট মনের চেয়ে নিবিষ্ট থাকতো মন আমার রেলের পাটির উপর, জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশংকায় । কিছুটা পথ পার হলেই স্বাভাবিক ভারসাম্য এসে যেতো শরীরে আর কন্ঠে বেঁজে উঠতো,

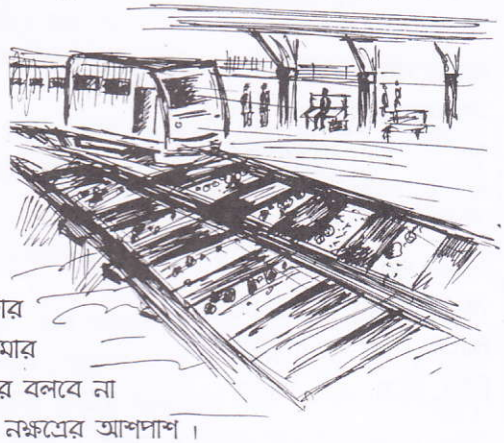

'পিরিতের-ই ঘর বানাইয়া অন্তরের ভিতর
দুই দিগন্তে রইলাম দুইজন সারা জনম ভর
হইলো না যে মধুর মিলন, পাইলাম না শুকসারীর দর্শন
এমন-ই কপাল, রেল লাইন বহে সমান্তরাল ।'

অনুভূতির খাতিরে গান নয়, গানের খাতিরেই অনুভূতির জন্ম দেয়াটা ছিলো নেহাত-ই স্বভাব । গানের মাঝ অন্তরাতে বামে তাকালেই বাগ-ই-আদম বাড়িটার সবুজে শরীর । শেষ অন্তরাতে ধর্মতলা । সেখানে শিমুল ছিলো । তার সাথে আমার তিন প্রজন্মের বন্ধুত্ব । আর কখনো সে আমাকে দাঁড় করাবে না, চিৎকার করে বলবে না "সিগনাল ডাউন" । আমার আর থামা হবে না । আমি তাকে খুঁজি এখন স্বাতি নক্ষত্রের আশপাশ ।

গান গেয়ে চলি । রেলের কু ঝিক ঝিক-এর মতো অবিরাম বেঁজে চলে 'রেল লাইন বহে সমান্তরাল ।' যে বিন্দুতে রেললাইনের মিলন হয়েছে বলে বিভ্রম হতো, সেই বিভ্রমটাকে বাস্তব করার ইচ্ছায় হেঁটে হেঁটে এক সময় পৌঁছে যেতাম রেলস্টেশনে । "যশোহর জংশন" নামটা আমার অস্তিত্বে কাঁপন তোলে অবিরত । রেলপাটি ছেড়ে উঠে পড়তাম স্টেশনের চত্বরে । জনকোলাহলের পাশ কাটিয়ে ফুটওভার ব্রিজে বসেই এককাপ চা আর একটা সিগারেট । ওইখানে বসেই বিনীতাকে চিঠি লেখেছি অনেক, যে অনুভূতি লেখায় ফুটে উঠতো, তা বিনীতার কাছে থাকতো অপ্রকাশ্য । হেঁটে আসা পথের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মতো কখনো গেয়ে উঠতাম,

'বিনীতা কেমন আছো? বিপদ আমার...'

সন্ধ্যাটা এলেই অন্ধকার সাথে নিয়ে ষষ্ঠীতলার ভেতর দিয়ে চলে আসতাম টাউনহল ময়দান । বহুমানুষের ভিড়ে আমি ছিলাম নিতান্ত একজন । ঐ লোকারণ্য আমাকে টানতো দুর্নিবার । মফিজ নামের ছেলেটাকে মনে পড়ে । যার হাতের রেখার সাথে ভাগ্যের রেখায় ছিলো রাত-দিনের তফাৎ, অথচ তার চা-এ ছিলো গভীর ভালোবাসা । তাকে বলতাম, 'এক কাপ ভালোবাসা দাও ।' ভালোবাসার সে দাম ছিলো অপরিশোধযোগ্য । আমরা কথামালায় গেঁথেছিলাম আমার বন্ধুত্ব । ঐ পুকুর আর সিনেমা হলের পেছনের রোয়াক আজো স্বাক্ষী হয়ে আছে । সেখানে আমি ও মফিজ নেই । জানি আর বসা হবে না কোনোদিন । ভৈরব ব্রীজের রেলিং-এ বসে কাটতো লম্বা সময় । জলহীন নদীকে মৃত বলে, ভৈরব তার চেয়ে হীন । তবু ঐ ভৈরব আমাকে ভাসিয়েছে অনেক । আজও তার অভিমান আমাকে কাঁদায় অহর্নীশ ।

'আমি ঝাঁপ দেবো তার জলে,
জানি অভিমানী ভৈরব ভেজাবেনা আমায় ।'

বিকাল পর্যন্ত সখিনা স্কুলে প্রবেশাধিকার ছিলোনা, তাই বেশ রাত হয়ে যেতো তবু যেতেই হতো আমাকে । পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই অভিমানী ভৈরব, তার পাড়ে পাঁকুড় গাছ । গাছের তলাতে দারুণ যত্ন নিয়ে নিকোতো মেয়েরা । সেখানে বসেই আমি দেখতাম জোনাকী । ভৈরবের বুকে কচুরিপানার নীল ফুলে দেখেছিলাম জোনাকীর আলোর দ্রোহ । এইভাবে আমার কবিতা লেখা শুরু ।

'তুমি জোছনায় নীল ফুলে বসা
জোনাকী দেখে উচ্ছ্বসিত হও,
এবার তোমার জন্ম কবিরূপে ।'

রোদ্দুরের গা বেয়ে জারুলের নীল রঙকে আমি মিশতে দেখেছি কচুরীপানার ফুলে, আমি আকাশের গা বেয়ে মেঘকে নেমে যেতে দেখেছি পাহাড় চূড়ায়, আমি দিনের শেষ আলোকে দেখেছি লাল রঙ ধার করে নিয়েছে কৃষ্ণচূড়ায় । তবু ঐ জোনাকী আর কচুরিপানা ফুলের দ্রোহ আমাকে আজো পালাতে দেয়নি, শরীর থেকে মুছে নেয়নি বহু বর্ণের দাগ ।

নিজের টিউশনির টাকায় কেনা হিরো রেঞ্জার সুইং সাইকেলটার রঙ ছিলো সবুজ । রঙটা ভীষণ প্রিয় ছিল বিনীতার, সাইকেলটাও । কোন কোন রাতে বেরিয়ে পড়তাম । বিমানবন্দর বাইপাস সড়কটাতে তখনও পিচের আস্তরণ পড়েনি, এমনকি ইটের সলিংও না । মেঠো একটা পথ । দুইপাশে ফসলের মাঠ, হঠাৎ হঠাৎ বিশাল শিমুল গাছ । আমি যেতাম, সঙ্গী হিরো রেঞ্জার । পথের শেষটা যেখানে মিলেছে পিচের রাস্তায়, ঠিক তার আগে একটু খোলা মাঠ, হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তাম । রাতের তারাদের চিনেছি ঐখানে শুয়ে ।

'সবুজ রঙের একটা সাইকেল ছিলো আমার ।
চুরি গেছে সাইকেল
জীবন অঙ্কে
আমাকে করিয়ে
বোচপ ফেল ।'

বাবার কোনমতে চালিয়ে নেয়া ব্যবসাটাকে নিজের ভবিষ্যত বলে জানতে শেখা আমি, পড়াশোনাটাকে নিয়েছিলাম জীবনের তৃতীয় বিষয় হিসেবে। সকালটা ঐ তৃতীয় বিষয়ের খাতে ব্যয় হতো । দুপুরের শুরু পৌরপার্কে তাস খেলে । ২৯ ছিলো আমাদের প্রিয় খেলা । সঙ্গী হিসেবে যারা ছিলো, তারা সবার চোখে ছিলো নিষিদ্ধ । আমি তাদের ভেতরটা দেখেছিলাম । তাদের বন্ধনহীন বন্ধনে কোন দায় ছিলো না । সময়টাকে উপভোগ্য করাটাই ছিলো একমাত্র উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সহজ হতো কখনো কখনো, কখনো কখনো গুণতে হয়েছে চড়া মাশুল । আমাদের তাতে আক্ষেপ ছিলো না । বস্তুত আমাদের ছিলো মুহূর্তনির্ভর জীবন । কোন অতীত নেই, কোন ভবিষ্যত নেই কেবল বর্তমান ।

পৌর পার্কের দুই পুকুরের মধ্যে একটার পানি স্বচ্ছ, অন্যটার ঘোলা । আমরা নেমে পড়তাম স্বচ্ছটার জলে । ভেজা কাপড় রোদেই শুকাতো । সে কাপড়ের শুকিয়ে যাওয়ার মতোই শুকিয়ে গেছে সে পুকুরে বন্ধু জাভেদকে হারানোর স্মৃতি । মাঝে মাঝে হঠাৎ কারো কারো দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মেলাতো । জানি না সেই দীর্ঘশ্বাস কখনো জাভেদকে ছুঁয়েছে কি না । সময় গড়িয়ে যেতো, ২৯ খেলায় ফলাফল আসতো না । 'এটাই শেষ কল' এই বলে খেলে যেতাম তবু । ফলাফল ছাড়াই খেলা শেষ হতো বেশিরভাগ দিন । তখন জানা ছিলো আমাদের সবার জীবনটাই একদিন এভাবেই এই ২৯-এ ঘুরপাক খাবে ।

খাবারের জন্য তখন বাড়ি ফেরার তাড়া । বিকালের শুরু হতো এম এম কলেজের দিকে যাত্রা শুরু করে । সেখানে শহীদ মিনারের সিঁড়িতে আমার কিছুটা বসবাস । বাসা থেকে কিছুটা হাঁটলেই কারবালা মসজিদ । কবরস্থানটাতে কিছুটা সময় কাটিয়ে যেতাম । মাজারের বেদিতে বসলেই অজস্র ফুলের ঘ্রাণ । আমি গোলাপ ভালোবাসিনি কোনদিন কিংবা রজণীগন্ধা । আমার প্রিয় কেবল কাঠগোলাপ আর তার শুভ্রতা । কবরস্থান থেকে বের হলেই বন্ধু সুমনের বাড়ি । আজো তার মা আশা করে থাকে, আমি যশোহর গেলে তার কাছে যাবোই । আমিও ছুটে যেতে চাই । অথচ যাওয়া হয় না । কেবল ফিরে ফিরে আসা ।

আজ এই শহরটাতে, কিছুই মেলাতে পারিনা। রেললাইনের মিলন বিন্দুর পেছনে ছোটা এক ভ্রান্ত পরিব্রাজক মনে হয় নিজেকে।

মনের কষ্ট রইলো মনে

আব্দুল কাদের
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

বৃষ্টি বাদলে আকাশপানে
অশ্রু ঝরে চোখের কোণে
বিরাম যে তার নাই,
মন ভেঙেছে প্রিয় মানুষ
স্বপ্নগুলো রঙিন ফানুস
জীবনটা হায় হায় ।

আশা ছিল ছোট্ট ঘরে
সুখ থাকবে থরে থরে
স্বর্গ নিবে ঠাঁই,
জীবন হলো খেলার পুতুল
ইচ্ছাগুলো রইলো প্রতুল
আশার মুখে ছাই ।

যাবার বেলায় গেলো বলে
এনজয় বা খেলার ছলে
মুছে ফেলো স্মৃতি,
ভুলে যাও সব স্বপ্নগাঁথা
হৃদয় ভাঙা কষ্ট ব্যথা
আবেগের প্রেম-প্রীতি ।

স্মৃতিগুলো ভুলতে গিয়ে
অশ্রু ঝরে চক্ষু বেয়ে
নেইকো বিরতি,
কেমনে ভুলি এত আদর
ভুলতে গেলে ভাঙে পাঁজর
আর স্বপ্ন সারথি ।

মনের কষ্ট রইলো মনে
খাইলো জীবন সাধের ঘুণে
মৃত্যু শুধু বাকি,
মনের মানুষ অন্য ঘরে
পরম সুখে জীবন গড়ে
শুধু কষ্টে আমি থাকি ।

মানুষ বড় বহুরূপী
মনে থাকে ধ্বংস কুপি
বাইরেতে ফিটফাট,
অভিনয়ের ছড়াছড়ি
এ যেন রঙ্গ-রসের হাট ।

হায়রে মানুষ রঙ্গ করো
এ ঘর ভেঙে ও ঘর গড়ো
কোন প্রীতির আশে,
ছাড়তে হবে রঙ্গ ভূমি
গর্ব করো কেন তুমি
হিসেব করো পিছে ।

বুকের ভিতর দারুণ খরা
কষ্টগুলো নাড়ে কড়া
দুঃখ কোথায় রাখি,
যে দিয়েছে এত ব্যথা
মনে পড়ে তারি কথা
নিঠুর পরাণ পাখি ।

আমরা যে ড্রাইভার

মোঃ মামুন হোসেন
ড্রাইভার
ব্যাবিলন ট্রিমস্ লিমিটেড

পাশে আছি, থাকবো সবাই,
আমরা সারাক্ষণ,
নিয়ম কানুন দিয়ে গড়া,
মোদের ব্যাবিলন ।

বলবো কি ভাই
ব্যাবিলনের কিছু নিয়ম-নীতি?
ব্যাবিলন ডিপার্টমেন্টে
চলেনা দুর্নীতি ।

আরো অনেক কথা আছে
বলবো নাকি ভাই,
ব্যাবিলনে বকাঝকার
কোন নিয়ম নাই ।

এইখানেতে আছে মোদের
অনেক অনেক শাখা,
শক্ত হাতে গড়া সেতো
স্বপ্ন দিয়ে আঁকা ।

ছোট্ট একটি শাখা সে যে
মোদের ট্রান্সপোর্ট,
এইখানেতেই ডিউটি করেন
বেঁধে সবাই জোট ।

মিলেমিশে থাকেন সবাই
নেইতো কোন ভয়,
এই চোখেতে দেখতে যে চাই
ব্যাবিলনের জয় ।

ঝড়-তুফানে করিনা ভয়
মানি না তো হার,
ব্যাবিলনের চোখের মনি
আমরা যে ড্রাইভার ।

শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও এর বিভিন্ন দিক

উত্তম ভৌমিক
জুনিয়র ম্যানেজার, রক্ষণাবেক্ষণ
অবনী টেক্সটাইলস্ লিমিটেড

যে কোন দেশের উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার পেছেনেও শিল্পায়নের অভাব ব্যাপকভাবে দায়ী। আর এই শিল্পায়নের অভাবের পেছনে রয়েছে কিছু মৌলিক কারণ। যেমন-

১। শিল্পের প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পদের অভাব
২। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব
৩। কাঁচামালের অভাব ইত্যাদি।

আবার শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর পুণঃব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শিল্পের অতিরিক্ত অংশ মানে বর্জ্য। এ দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়টি দুর্বল। যার ফলে শিল্প বর্জ্য পরিবেশের প্রতিনিয়ত ক্ষতিসাধন করে যাচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিক না হওয়ার পেছনে শিল্প মালিকদের অনীহা এবং অসচেতনতা যেমন দায়ী তেমনি সরকারের আইন প্রয়োগ এবং তদারকির অভাবও রয়েছে। একই সাথে এটির অপ্রচলন একটি কারণ। তবে আশার বিষয় বর্তমানে শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এ দেশের শিল্প ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়ে উঠছে।

এ দেশের শিল্প হতে যে ধরনের বর্জ্য বের হয় তা মূলত তরল বর্জ্য এবং কঠিন বর্জ্য। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ETP) ব্যবহার করা হয় যা ইন্ডাস্ট্রির অভ্যন্তরে স্থাপিত থাকে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থার জন্য ইন্ডাস্ট্রি নিজস্ব ব্যবস্থাপনা নিতে পারে অথবা সিটি কর্পোরেশন বা ঐ এলাকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে বাংলাদেশে এটির উল্লেখযোগ্য কোন উদাহরণ নেই। যা হোক, এ দেশের মালিক শ্রেণীর খুব প্রচলিত ধারণা হয়তো- শিল্পের তরল বর্জ্য সাধারণ পানিতে (নদী, খাল) পড়লে এমন কি ক্ষতি? এটির প্রত্যক্ষ তেমন ক্ষতি আমরা দেখতে পারিনা কিন্তু পরোক্ষভাবে এর প্রভাবে শিল্প এবং ব্যবসা উভয়ই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন শিল্প বর্জ্য নদীর পানিতে ফেলার কারণে ঐ নদীর ইকোলজী সিস্টেম ব্যাহত হয়। পানির প্রয়োজনীয় অক্সিজেন (DO) কমে যায় এবং জীবতাত্ত্বিক অক্সিজেন চাহিদা (BOD) বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ ঐ নদীর জীবগোষ্ঠী ধ্বংস হয়। এর ফলে মৎস শিকারের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী তাদের কর্মসংস্থান হারায়। আবার আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কৃষকই সেঁচের জন্য নদীর পানির উপর নির্ভরশীল। শিল্প বর্জ্যের কারণে ঐ পানি বিষাক্ত হয়ে যায়। ফলে কৃষকশ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কৃষক, জেলে প্রত্যেকেই এ দেশের ক্রেতাগোষ্ঠীর বড় একটা অংশ। এদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া পরোক্ষভাবে শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

তাই আমরা যদি যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করি তাহলে আমরাই (শিল্প মালিক) লাভবান হবো। আবার দেশের প্রেক্ষাপটে ইটিপি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট) করতেও প্রচুর ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে সরকার সহায়তামূলক কার্যক্রম রাখতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধের কথা–মুক্তিযোদ্ধার কথা

ডাঃ মোঃ মোজাহারুল হক
মেডিক্যাল অফিসার
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার কমপ্লেক্স

রাজশাহীর পোরশা থানার অন্তর্গত (বর্তমান নওগাঁ জেলার সান্তাহার থানা) তিলনা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ছোট বড় আঠারটি পাড়া নিয়ে গ্রামটির বিস্তার। তিলনার ঐতিহ্যই হচ্ছে তিলনা হাই স্কুল– যার প্রতিষ্ঠাতা এডভোকেট বশির উদ্দীন আহম্মেদ। প্রধান শিক্ষক মোজাফফর হোসেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষনের পর আমরাই প্রথম প্রায় দেড়শ ছাত্র–শিক্ষক–কৃষক–শ্রমিক, লাঠিসোটা–তীর–ধনুক নিয়ে স্কুল মাঠে ট্রেনিং শুরু করি। এখানে সুসংগঠিত ট্রেনিং হচ্ছে জানতে পেরে মেজর নাজমুল হক একজন হাবিলদার সাথে নিয়ে নওগাঁ থেকে আমাদের মাঝে হাজির হলেন। তিনি এলেন ছদ্মবেশে। পরনে লুঙ্গি হাফহাতা শার্ট, মাথা ন্যাড়া করা। পরবর্তী সময়ে তিনি ৭নং সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন। অনেক কথার পর আমরা তার পরিচয় জানলাম। পরের দিন সকালেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। সিদ্ধান্তমতে যথা সময়ে মেজর নাজমুলের নেতৃত্বে ভারতের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। বিকেলে পশ্চিম দিনাজপুরের গেরিলা ক্যাম্প বালুরঘাটে পৌঁছালাম। আক্ষেপের বিষয় হলো বাংলাদেশের সাথে এই ক্যাম্পের কোন পূর্বচুক্তি কিংবা সমঝোতা না থাকায় ওখান থেকে আমাদের ফিরে আসতে হলো। আমরা সাপাহারে ফিরে এলাম। পরের দিন হাটশাওল (তৎকালীন ইপিআর) ক্যাম্পের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। মেজর নাজমুল হকের নেতৃত্বে এবং হাবিলদার মোহাম্মদ উল্লাহ, মোহাম্মদ আলী প্রমুখের তত্ত্বাবধানে আমাদের ট্রেনিং শুরু হলো। মেজর নাজমুল হক আমাদেরকে রেকি, এ্যামবুস এবং রেইড বিষয়ে ট্রেনিং প্রদান করেন। ইতোমধ্যে ভারত সরকারের সাথে ট্রেনিং, শরনার্থী ইত্যাদি বিষয়ে সমঝোতা হয়ে গেছে। আমরা আবার পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট ট্রেনিং সেন্টারে ফিরে গেলাম। ক্যাম্পের পাশেই শাহ আব্দুল খালেকের (তৎকালীন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক) নেতৃত্বে আমাদের অফিস প্রতিষ্ঠিত হলো। আমাদের মাননীয় এমপি ডা: মো: বশিরুল হক শাহ চৌধুরী, ডা: মো: তাহের উদ্দিন, আব্দুল কালাম, গোলাম কাদের, মোকলেসুর রহমান, চৌধুরী মকাই ভাই, ডা: মো: শামসুল হক, রোস্তম আলী প্রমুখের সমন্বয়ে আরো একটি দল ইতোমধ্যে জড়ো হয়েছে। আমাদের ক্যাম্প হতে শাহ আব্দুল খালেকের নেতৃত্বে এবং রাজবীর সিং এর সহায়তায় একটি ব্যাচকে ট্রেনিং এর জন্য শিলিগুড়িতে পাঠানো হয়। কয়েকদিন পরে ছাত্রলীগের বাছাই করা বিশজন ছাত্রকে নিয়ে আমরা শিলিগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়িতে ট্রেনিং এর জন্য চলে আসি। ১১ দফা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ সহচর তোফায়েল ভাই আমাদেরকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং ব্যবস্থা করেন।

জলপাইগুড়ি থেকে আকাশপথে প্রথমে শিলিচর এবং ওখান থেকে ট্রেনে করে আসামের হাফলংয়ে আমাদের নিয়ে আসা হয়। সেখানে দেড় মাস ধরে আমাদের গেরিলা ট্রেনিং চলে। রাত্রিবেলা আমরা পলিটিক্যাল ক্লাস করি। একদিন সকালবেলা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আব্দুর রাজ্জাক ভাই এবং ভারতীয় জেনারেল রুবান হেলিকপ্টার যোগে আমাদের মাঝে উপস্থিত হন। রাতে আমাদের পলিটিক্যাল মিটিং হয়। ট্রেনিং শেষে আমরা জলপাইগুড়িতে চলে আসি। জলপাইগুড়িতে মুজিব বাহিনীর আরেক সংগঠক স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নিউক্লিয়াস বলে পরিচিত সিরাজুল আলম খানের সাথে দেখা মেলে। তার সাথে ট্রেনিং, যুদ্ধ এবং পলিটিক্যাল বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হয়। জলপাইগুড়িতে মনি ভাই (মার্শাল মনিরুল হক) এবং কাজী নুরুন্নবী (সভাপতি, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ) ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। নুরুন্নবী ভাই আমাকে বললেন– তুমি ক্যাম্পে থাকো, আমাদের ডাক্তার দরকার। আমি তখন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। আমি বললাম– আমি দেশে যাবো এবং যুদ্ধ করবো। নুরুন্নবী ভাইও বললেন– তিনি দেশে ঢুকবেন। সত্যি সত্যি একদিন নুরুন্নবী ভাই সাপাহার, পোরশা, নেয়ামতপুর, তানোর হয়ে প্রায় একশত মাইল পায়ে হেঁটে রাজশাহী শহরে ঢুকলেন। একদিন মেডিকেল কলেজে রেড দিতে গেলে পাকবাহিনীর দোসর কুখ্যাত আলবদরেরা তাকে চিনে ফেলে এবং ধরে নিয়ে যায়। আমরা তাকে আর খুঁজে পাইনি। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শহীদ নুরুন্নবী ছাত্রাবাস তার কথা মনে করিয়ে দেয়।

জলপাইগুড়ি হতে সিরাজুল ইসলাম খান আমাদেরকে মিলিটারী ভ্যানে করে একটা দিঘীর পাড়ে নিয়ে আসেন। মাছ ভাত দিয়ে

আপ্যায়ন করে আমাদের হাতে একটি করে অস্ত্র তুলে দিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। আমি, মোদাচ্ছের ভাই, নজরুল, মামুনসহ অনেকেই এক সঙ্গে বাংলাদেশে প্রবেশ করলাম। আমাদের কাজ ছিলো লোক জোগাড় করে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং শুট এন্ড স্কুট। আমরা সবাই যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমাদের দলে ছিলো আব্দুল্লাহ আল মামুন। রাজশাহী ক্যাডেটের ছাত্র। ট্রেনিং এ অত্যন্ত চৌকস মামুন ভাই শুটিংয়ে দশ এ দশ স্কোর করতো। একটা অপারেশনে পাক হানাদারদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড চার্জ করেন মামুন। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রেনেড ব্লাস্ট হয় না। পাক হানাদার এবং তাদের দোসরদের হাতে ধরা পড়ে আল মামুন। আমরা আজও তাকে খুঁজে পাইনি। মহান আল্লাহর কাছে মামুনসহ সকল শহীদের জন্য মাগফেরাত কামনা করি। আগস্ট মাসের শেষের দিকে আমরা দলবলসহ পত্নীতলায় মান্দাইল গ্রামে অবস্থান নিলাম। পাক বাহিনীর সাথে এখানে ভীষন যুদ্ধ হলো। আমাদের আক্রমনে পাকবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলো। আমাদের গেরিলা বাহিনীর মুখ্য কাজই ছিলো নতুন নতুন লোকদের দলে ভেড়ানো, তাদেরকে গেরিলা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শুট এন্ড স্কুট (গুলি করো ও পালাও)। মান্দাইন গ্রামে সম্মুখ যুদ্ধের পরের দিনই আমরা ঐ এলাকা ছেড়ে গেলে পাকবাহিনী মান্দাইন গ্রামে ঢুকে জ্বালাও পোড়াও এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। মজিদ মাস্টারের বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। মজিদ মাস্টারের এক ছেলেও আমাদের সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের সময় আমাদের আশ্রয়দাতা জহিরউদ্দীন এবং নইমউদ্দীনকে ধরে নিয়ে নৃসংশভাবে হত্যা করে। আমাদের গাইড মছির ভাই (মছির মাস্টার) এবং গফুরকেও তারা ধরে নিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসেনি।

পাকবাহিনী যাতে সহজে গ্রামে ঢুকতে না পারে সে জন্য মছির মাস্টারের নেতৃত্বে মাটি আক্কারের ব্রীজটি ভেঙে ফেলা হয়। এই অপরাধে পাকহানাদারেরা মছির মাস্টারের বাপ বশির মাস্টারসহ সাতজনকে নৃসংশভাবে বড় খাইরা ব্রীজের উপর ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে ব্রীজের নীচে মাটি চাপা দিয়ে রাখে। ১৯৯৬ সালে ব্রীজের নীচ থেকে লাশগুলোর কংকাল তুলে ব্রীজের পাশে গণকবরে শায়িত করা হয়। এই জায়গায় একটি স্মৃতিসৌধ বানানোর জন্য সরকারের প্রতি আবেদন রাখছি।

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক কমান্ডারের নেতৃত্বে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। দু'পক্ষেরই অনেক লোক হতাহত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা গেটে পাকবাহিনী কর্তৃক বন্দী হন এবং লুৎফর রহমান শহীদ হন। আমরা জানতাম পাকবাহিনী গেটেকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু রাখে আল্লা মারে কে? দেশ স্বাধীন হওয়ার পনের/ষোল বছর পর হঠাৎ আমাদের গেটে বাড়িতে এসে হাজির হন। তার কাছে শুনলাম- পাকবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে। সে ভালো উর্দু বলতে পারতো। পাক সেনারা তাকে দিয়ে চিঠি পড়ানো এবং চিঠি লেখার কাজ করাতো, সে জন্যই হয়তো তাকে মেরে না ফেলে ক্যাম্পে বন্দী করে রেখেছিলো। গেটে বর্তমানে আমেরিকাতে আছে। আমরা গেরিলারা সব সময় বাংলাদেশের ভেতরেই থাকতাম এবং শত্রুর কাছাকাছি থেকে অপারেশন পরিচালনা করাই আমাদের দায়িত্ব ছিলো। আগস্ট মাসের এক রাত্রিতে আমরা কয়েকজন পদলপাড়া থেকে নিজ গ্রাম বোরামপাড়ায় আসি। বাবা-মা-ভাই-বোন এবং অসুস্থ চাচীকে দেখে পদলপাড়ায় ফিরে আসি। পরের দিন শুনলাম আমরা বাড়ী থেকে বের হবার পরপরই পাকহানাদার বাহিনী এবং রাজাকার- আলবদররা আমাদের বাড়িতে হানা দিয়ে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমার বাবার অপরাধ তার ছেলে একজন মুক্তিযোদ্ধা। আব্বা বন্দী অবস্থায় নাজিরপুর ক্যাম্পে নিয়মিত নামাজ এবং কোরান শরীফ পড়তেন। হয়তো সে জন্যেই সাতদিন পর পাকহানাদারেরা আব্বাকে ছেড়ে দেয়।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকের ঘটনা- আমার এক আত্মীয় মওলা বক্সকে রাজাকার আলবদরেরা গাংগটিয়া হাটের কাছে বেদম মারপিট করে। তার অপরাধ তার বাড়িতে মুক্তিফৌজরা আশ্রয় পায়। সত্যি সত্যি এদিন আমরা তার বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। আমার চাচা মোদাচ্ছেরও আমার সাথে ছিলো। বিকেলে জনাকয়েক রাজাকার এ বাড়িটি ঘেরাও করে। আমাদের কাছে রাইফেল এবং এলএমজি ছিলো। আমরা ব্রাশ ফায়ার করে তাদেরকে মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু পরবর্তীতে রাজাকার এবং পাকহানাদার বাহিনী সম্পূর্ণ গ্রাম জ্বালাও পোড়াও করে, গ্রামের মানুষজনকে মেরে ফেলতে পারে- এই ভেবে রহিমা ভাবীর সহায়তায় আমাদের অস্ত্রগুলো লুকিয়ে ফেলি। কিন্তু তারা আমাদেরকে ধরে ফেলে। মোদাচ্ছের ক্লাশ নাইনের ছাত্র। রহিমা ভাবী তাকে তার ছেলে পরিচয় দিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে রাজাকারদের নিকট থেকে ছাড়িয়ে রাখে। কিন্তু রাজাকারেরা আমাকে বেঁধে ফেললো এবং ভীষণ মারধর করলো, আমার হাতের বাঁধন ছিলো সামনে। কোন রকমে ঢিল করে বাঁধন থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলাম এবং বিদ্যুৎ বেগে দৌড়ালাম। ইচ্ছা করলে তারা গুলি করতে পারতো, কিন্তু কেন জানি তা করলো না। আল্লাহর কৃপায় ঐ যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

আমি চিকিৎসক হিসেবে এখনো কর্মরত আছি। আমার এক ছেলে এবং এক মেয়ে। ছেলে আমারই পেশায় এবং মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছে। মাঝে মাঝে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলি। দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে বলি।

বাঙ্গালি আমি

মোঃ কবিরুল ইসলাম
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

বাঙ্গালি আমি ভুলে গেছি
নিজ ঐতিহ্যের কথা,
ছুঁড়ে ফেলেছি লুঙ্গি ও শাড়ি
সাধের নকশিকাঁথা ।

ভাল লাগেনা আউল-বাউল
জারি-সারি কবি গান ।
বৈশাখী সাঁজে সেঁজে শুধু
হাঁকি বাঙালির শ্লোগান ।

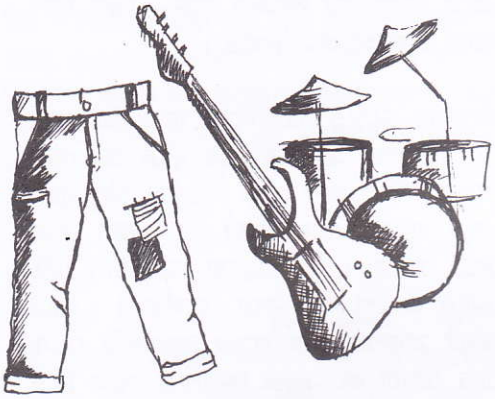

বাঙ্গালি আমি একতারা ফেলে
গিটার নিয়েছি হাতে,
ঢাক-ঢোল ফেলে প্যাড ধরেছি
লজ্জা কিসের তাতে ।

বাঙ্গালি আমি লালন ছেড়ে
ধরেছি ব্যান্ড গীতি,
হাসন, কানাই-লোকগীতি সব
এখন শুধুই স্মৃতি ।

মাছে আর ভাতে বাঙ্গালি আমি
আজ শুধু ইতিহাস,
গর্বের সেই মসলিন নেই
নেই রাজাদের বাস ।

বিদায় বন্ধু

সুমাইয়া আক্তার
জেনারেল অপারেটর, সুইং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বন্ধু আমার দিন ফুরালো
এবার যাবার পালা,
হাসি মুখে দিলাম বিদায়
গুছিয়ে মনের জ্বালা ।

সন্ধ্যা রাতে দুপুর সাঁঝে
নিরব নির্জনে,
বন্ধু তোমার স্মৃতিকথা
পড়বে জানি মনে ।

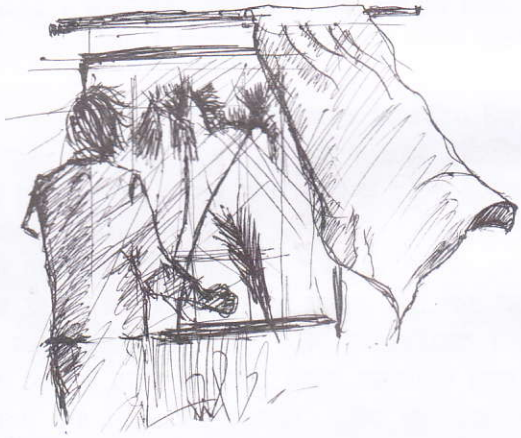

তখন আমার মন ভেঙে যদি
অশ্রু চোখে আসে,
ভাববো আমি বসে আছি
এইতো তোমার পাশে ।

নিশি নিরালায় বেলা অবেলায়
দুঃখ-সুখের কথা,
শোনার মানুষ নেইতো কাছে
ভাবতে লাগে ব্যথা ।

হাতে হাত রেখে পাশাপাশি বসে
কাটিয়েছি কতক্ষণ,
এখন আমি একা পাশে কেউ নেই
নিরবে সারাক্ষণ ।

ব্যাবিলন আমার জান ব্যাবিলন আমার প্রাণ

ময়না
অপারেটর, সুইং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

রোজ সকালে আসি ব্যাবিলন
তোমায় দেখার আশায়,
জীবন মোদের ধন্য হলো
তোমার ভালোবাসায় ।

ব্যাবিলন তোমার বুকে পেলাম
মায়ের ভালোবাসা,
তুমি আমাদের সুখের স্বপ্ন
মনের রঙিন আশা ।

তোমায় নিয়ে আমরা সবাই
অনেক করি গর্ব,
তুমি আমাদের সুখের স্বপ্ন
তুমি আমাদের স্বর্গ ।

ব্যাবিলন তোমায় ছেড়ে যেতে
মনে লাগে মায়া,
ব্যাবিলন তোমার আঁচল যেন
বটবৃক্ষের ছায়া ।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

ইথার আখতারুজ্জামান
জুনিয়র অফিসার, মার্কেটিং এন্ড মার্চেন্ডাইজিং
ওভেন টপস্, ব্যাবিলন গ্রুপ

আজকাল নির্জনতা স্থির হয়ে থাকে
মুখোমুখি বারান্দায়

যাবতীয় অভিমান জমে থাকে
ধুলোমাখা ঘড়িতে
ক্যাকটাসের টবে
জলশূন্য একুরিয়ামে
অক্ষরবিহীন সাদা পাতায়!

অথচ,
দুপুরে প্রতিটি রোদ একটা ঘ্রাণ শুকে নেবার জন্য
অপেক্ষায় থাকতো.... সাথে আমাকেও অপেক্ষায় রাখতো

সাদা ব্লাউজের অমীমাংসিত কৌতূহলের উপর
কখনো সবুজে, কখনো নীলে.... কিংবা
গোলাপি সুতা জড়ানো থাকতো....!

মাঝে মাঝে
ছায়া ছায়া মেঘদের কারণে
বিজ্ঞাপন বিরতি ঘটতো ।

চুলেতে বাতাস দুলতো....
দোলাত আমার দৃশ্যলোক

স্নানের জল হবার সাহস দেখাতাম না
.... তবে
ভীষণ তোয়ালে হতে ইচ্ছে করতো,

সমস্ত দেহ থেকে ঝিলমিল রোদের ভেতর
ওপারের বারান্দায় ঝরে ঝরে পড়তো চিত্রনাট্য,

দাঁড়িয়ে দেখতাম
একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র!

নীল বৃন্তে বন্দী

মেহেদী হাসান
অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

মা,

কেমন আছো তুমি? ঘুম থেকে উঠে ছুটির দিনটা কি করে কাটাবো তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম- তোমায় একটা চিঠি লিখে ফেলি। তোমাকে তো জীবনে কখনও চিঠি লিখিনি কিন্তু ফোনে বলা যায় না এমন অনেক কথা জমে আছে তোমাকে বলার জন্য। সেই ছোটবেলা থেকে তুমি শিখিয়েছো মায়ের কাছে কিছু লুকোতে নেই। কোনদিন কিছু লুকোইনি তোমার কাছে। আনন্দ, কষ্ট, ভালোলাগা- সব শেয়ার করেছি তোমার সাথে। কিন্তু আজ এই চিঠিটা লিখতে গিয়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হয়তো চিঠি লেখার অভ্যাস নেই বলে। স্মার্টফোন, ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ আর ইন্সট্রাগ্রামের যুগে এই প্রজন্ম চিঠি আর কেনই বা লিখবে? আমি অবশ্য নিজেকে কখনোই এই উত্তর-আধুনিক প্রজন্মের একজন ভাবি না। ভাবার কোন সুযোগই নেই। কেন, তার ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই। সেদিন শেষ বিকেলে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। লাভ রোডের ওয়াক ওয়েতে আমার সামনে হাঁটছিলো একজোড়া টিনেজ ছেলে-মেয়ে। বাচ্চা দেখতে মেয়েটা কি অদ্ভুত সুন্দর ভঙ্গীতে ছটফটিয়ে কথা বলছে, "ওহ্ রিয়েলি! রাফসান বুঝি তোমার ফ্রেন্ড!! ওর সাথে তো চারমাস আগেই আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে। ফাজিলটা না এতগুলা পঁচা! ওর ফোনে কক্ষনো চার্জ থাকে না। এখন ও আমাদের অদিতির বয়ফ্রেন্ড। আচ্ছা, তাহলে তো তোমার রাফসানের ফ্রেন্ড জিতুকেও চেনার কথা। লাস্ট উইক পর্যন্ত ওই আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল। ছেলেটা কিউট, কিন্তু একদম আনস্মার্ট। চুলে কিভাবে স্পাইক করতে হয় তাই জানে না। ওয়েল, এখন আমি ফ্রি আছি, চাইলে তুমি আমার সাথে দুই মাসের জন্য কন্ট্রাক্ট রিলেশনশীপে আসতে পারো, ভালো লাগলে কন্টিনিউ, নইলে ব্রেক-আপ।"

অবাক হচ্ছো মা? এরা এখন আর আমাকে অবাক করে না। এই ফাস্টফুড জেনারেশন শুধু ফোর এমবিপিএস স্পিডে নেট সার্ফিংই করে না তার চেয়েও দ্রুতগতিতে ভালোবেসে ফেলে আর একেবারে তুচ্ছ সব কারণে সেই ভালোবাসা আরো দ্রুত ভুলেও যায়। অথচ তোমার মনে আছে মা? আমাদের এলাকার সেই মেয়েটির কথা! যাকে শুধু একটিবার দেখার জন্য তোমার ছেলে সকাল-দুপুর রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। টানা দুই বছর তোমার ছেলেটা শুধু দাঁড়িয়েই থেকেছে, উপেক্ষার ভয়ে কখনো মেয়েটার সাথে কথা বলার সাহস করেনি। কিশোরী মেয়েটা হয়তো প্রথমদিকে বুঝতেই পারে নি তার জন্য এক রাজ্য নিরব মুগ্ধতা নিয়ে পথের পাশে কেউ অপেক্ষা করে থাকে। যেদিন সে প্রথম বুঝতে পারলো তার সেই ফিডব্যাকটা কি অসাধারণ ছিল মনে আছে মা! মেয়েটা সরাসরি তোমার কাছে নালিশ করলো। বেচারী বালিকা ভেবেছিলো মায়ের চোখ রাঙানী, বাবার শাসন বালকের মোহভঙ্গ ঘটাবে। তোমার ছেলে যখন বালিকার ধারণা ভুল প্রমাণিত করলো বালিকা তখন সত্যিই বিপদে পড়ে গেলো। অনেক সুন্দর মেয়েরা নাকি বোকা হয়, এই মেয়েটাকে সৃষ্টিকর্তা রূপ আর বুদ্ধি দুইটাই দিয়েছিলো। মেয়েটা দুই পরিবারের পুরনো রেষারেষি আর দাম্ভিক অহং এর কথা জানতো। মেয়েটি জানতো দুই পরিবারে কেউই কখনও এই সম্পর্কের স্বীকৃতি দেবে না। তোমার ছেলে যে জানতো না তা না, কিন্তু তার ঐ সময়কার উদীয়মান সূর্যের মত তারুণ্যের শক্তি আর আবেগের তীব্র জলোচ্ছ্বাসের কাছে গোঁড়ামীর খড়কুটোকে খুব তুচ্ছ মনে হতো। স্বাভাবিকভাবেই দেরিতে হলেও সেই উচ্ছল জলোচ্ছ্বাস একসময় মেয়েটাকেও স্পর্শ করলো, ভিজিয়ে দিলো, গলতে শুরু করলো প্রতিরোধের বরফ। তারপর শুরু হলো দুর থেকে যেতে যেতে একটু ফিরে চাওয়া, একটু লাজুক হাসি, একটু ভ্রূকুটি। বিশ্বাস করো মা, ওই একটুখানি হাসি, চকিত চাহনি তোমার ছেলের হৃদয়ের ভিতরে ঢুকে প্রতিটি রক্তকনিকা নিয়ে খেলা করতো। ছেলেটার কাছে পৃথিবীটা ছিলো তখন স্বর্গ। রাস্তার পাশের ডাস্টবিনকে মনে হতো জয়নুলের ল্যান্ডস্কেপ, রাস্তার রিকশাগুলোকে মনে হতো এক একটা প্রজাপতি, তোমরা যদি বকা দিতে, সেটাও তখন তার কাছে বিটোফেনের নবম সিম্ফনির মতো মিষ্টি লাগতো।

সেকেন্ড সেশনে শুরু হলো কল্পনায় ইচ্ছের ঘুড়ি ওড়ানো, লুকিয়ে দেখা করা, রাত জেগে ফোনে কথা বলা। ইতোমধ্যে মেয়েটা স্কুল ফাইনাল দিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিকে ভর্তি হলো। হঠাৎ তোমার ছেলের বোধোদয় হলো। সে জানতো মেয়েটার পরিবার এই রিলেশনশীপের ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করে ফেলেছে। ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রনের বাইরে যাওয়ার আগেই যে কোন সময় তারা জোর করে হলেও মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দেবে। তোমরাও কখনও পুত্রবধূ হিসেবে ঐ পরিবারের মেয়েকে মেনে নেবে না।

তোমার ছেলে তখন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড, তার তো আর বৃটিশ সিংহাসন ছিলো না । সে তার ভালোবাসাকে হারাবার ভয়ে তার জীবন নিয়ে সবচেয়ে বড় জুয়াটা খেললো । তার পড়াশোনা, পরিবার, প্রাণপ্রিয় বন্ধু-বান্ধব, প্রিয় আড্ডাস্থল আর তীব্র হোমসিকনেসকে পেছনে ফেলে ইট-পাথরের এই শহরে এলো নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে । ছোটবেলা থেকে যে ছেলেটাকে তুমি কক্ষনো অভাব কি তা বুঝতে দাওনি, আগলে রেখেছো প্রাচুর্যের নিরাপত্তায় হঠাৎ করে সেই ছেলেটা কষ্ট সমুদ্রে পড়লো । ডুবে গেলো না শুধু শরীরজুড়ে মেয়েটার ভালোবাসা লাইফজ্যাকেট হয়ে জড়িয়ে ছিলো বলে । যে ছেলেটাকে তুমি মুখে তুলে খাইয়ে দিতে, কতো বেলা যে সে না খেয়ে কাটালো, বাসা ভাড়া বাঁচাতে নিকুঞ্জ থেকে হেঁটে গেলো বনানী, গুলশান, উত্তরা । এই করে ছেলেটা টাকা জমাতো সেল ফোনের বিল দেওয়ার জন্য আর মাসে একবার মেয়েটার সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্য । তুমি হয়তো প্রথমদিকে টেরই পাওনি মা যে তোমার ছেলে চুপি চুপি তোমার শহরে মেয়েটার কলেজে এসে দেখা করে আবার ফিরে যায় । না, তোমার ছেলের যে একবারও তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হয়নি তা ঠিক নয়, সে আসলে তোমাদের "ভাঙবো কিন্তু মচকাবো না" এই ইগোটাকে খুব ভয় পেতো ।

যাইহোক, এক সময় মেয়েটার পরিবার জেনে গেলো এই গোপন অভিসারের কথা । শুরু হলো মেয়েটার ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার । জোর করে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হলো । এক পর্যায়ে মেয়েটা বাধ্য হলো তোমার ছেলের কাছে পালিয়ে আসতে । ঐ মুহূর্তে তোমার ছেলের কাছে বেশ কিছু টাকা ছিলো, ঐ শহরে তার পেশীশক্তিও মন্দ ছিলো না । খুব অনায়াসে সে মেয়েটাকে বিয়ে করে ঢাকায় ফিরে আসতে পারতো, ইনফ্যাক্ট সে এর জন্যই নিজেকে তৈরী করেছিলো । কিন্তু কি যে হলো ছেলেটার! তোমার আদর, স্নেহের বিগত বিশ বছরের সব স্মৃতি একটা একটা করে হঠাৎ তার মাথার মধ্যে অনুরণিত হতে থাকলো । সে ভাবলো 'তার মা অনেক কষ্ট পাবে ।' আচ্ছা, সে আরও একটা কথা ভেবেছিলো, সে তার পরবর্তী ভাইবোনদের সামনে কোন খারাপ উদাহরণ তৈরী করতে চায় নি । তার ধারণা ছিলো শেষ মুহূর্তে হলেও তার মা ইগোর চেয়ে তার সন্তানের চাওয়াটাকে গুরুত্ব দেবে । পরের গল্পটাতো তুমি ভালোই জানো, কমেডিকে ট্রাজেডীতে রূপান্তরের কৃতিত্বে তোমাদের তো আর কোন অংশীদার নেই । আসলে বয়স কম হলে যা হয় আর কি, নিজেকে সিনেমার হিরো বলে মনে হয় । সিনেমার বাবা-মায়েরা সন্তানের ভালোবাসা আর সততা দেখে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'তবে তাই হোক ।' বাস্তবের বাবা-মায়েরাও সেরকমই বলে, তবে সেটা বিচ্ছিন্ন করার কৌশলমাত্র । তোমার ছেলে তোমাদের ছল্, তোমাদের এক্সপ্রেশান দেখেই বুঝে গিয়েছিলো, কিন্তু মেয়েটা না মা আগে থেকেই জানতো ফিরে গেলে কি ঘটবে । অনেক কান্নাকাটি করেছিলো মেয়েটা, ফিরে যেতে চায়নি । সে জানতো এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হবে । জানো মা, সেই কান্নাভেজা চোখ দুটোর শেষ চাহনি আজও তোমার ছেলের ব্যস্ততাহীন একাকিত্বগুলোকে দুর্বিসহ করে দেয় ।

না মা, তোমাদের প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই । এই এতগুলো বছর আমি তোমাদের ছেড়ে দূরে আছি কোন অভিমানে নয় । আমার বন্ধুরা আমাকে হয়তো খুব সাহসী ভাবে । কিন্তু আমি জানি, আমি একটা ভীতু কাপুরুষ । তোমাদের ঐ ছোট্ট শহরের প্রতিটি কোনায় কোনায় আমার যে সুখ-স্মৃতিগুলো ছড়ানো আছে, ওগুলোর ভয়েই আমি ঘরছাড়া । স্মৃতিগুলো কষ্ট হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে তার মুখোমুখি হবার সাহস আমার নেই । তুমি-আব্বু হয়তো তোমাদের একটা সন্তানকে মিস করো, ভাইবোনেরা হয়তো তাদের একটা ভাইকে মিস করে, কিন্তু আমি একা তোমাদের সবাইকে মিস করি- সামেশানটা নিশ্চয় বেশী হওয়া উচিৎ । শেষ একটা অনুরোধ । তোমার পরবর্তী কোন সন্তানের ভালোর জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় অন্তত একবার তার চাওয়ার গভীরতাটুকু উপলব্ধি করার চেষ্টা করো । আমি চাই, তোমার আর কোন সন্তানকে যেন কখনও তোমার মিস করতে না হয় । ভালো থেকো মা.....

-ইতি
তোমার ছেলে
২৪শে শ্রাবণ, ১৪২১

প্রকৃতির পাগলামী

মৌমিতা
সিনিয়র অপারেটর, সুইং
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

গাছের ফাঁকে দেখতে যে চাঁদ
লাগছে অনেক ভালো,
কাজলা দিদির গল্প যে আজ
জ্যান্ত ফিরে এলো।

ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ শুনে
ভরলো আমার মন,
ব্যাঙগুলোর মেজাজ খারাপ
ডাকছে সারাক্ষণ।

হুতোমপেঁচা রাগ করেছে
সবার গল্প শুনে,
বাঁশবাগানের চিরল শব্দ
আমায় রেখো মনে।

গাঁয়ের মানুষ গভীর ঘুমে
জেগে আছি আমি,
চাঁদের বুকে মেঘের আঁচড়
প্রকৃতির পাগলামী।

সোনার বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আবুল কালাম
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

নারকেলের ঐ লম্বা মাথায়
সবুজ বরণ কেশ,
ছয় ঋতুর এই প্রকৃতিটা
দেখতে দারুণ বেশ।

গ্রীষ্মকালে পাকেরে ভাই
নানান রঙের ফল,
বর্ষাকালে চতুর্দিকে
পানির নামে ঢল।

শরৎকালে ফোঁটেরে ভাই
নানান রঙের ফুল,
শাপলা-শালুক, তালের পিঠার
যায় পড়ে যায় ধুম।

হেমন্তে আসে সোনালী রঙ
প্রকৃতিতে ভাই,
সোনার বরণ ধারণ করে
এ দেশটা যে তাই।

শীতে আসে চাদর গায়ে
ঠান্ডা শীতের বুড়ি,
পাতাঝরার পালা যেন
ঝরে গেছে কুঁড়ি।

বসন্তে গাছে-গাছে
রঙিন ফুলের কেশ,
সবুজ বরণ লাগে তখন
সোনার বাংলাদেশ।

স্মৃতির অন্তরালে

মোঃ মমতাজুল হাসান খান মিল্টন
এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
অবনী টেক্সটাইলস্ লিমিটেড

ঈদ-উল-আযহার আর ক'দিন বাকি।
কোরবানীর গরু কিনতে হবে, কখন কিনবো, সময় হয়ে এলো- কিন্তু তুমি নেই, তুমি ছাড়া সবকিছু যেন অগোছালো লাগছিলো।
গরু কেনা হয়েছে, তুমি দেখবেনা বাবা, তুমি কোথায়? তোমাকে চুপিসারে কতো ডাকছি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছোনা? অনুভূতির অন্তরালে তোমাকে যত্রতত্র খুঁজে ফিরছিলাম।
এইতো বাবার শোবার কক্ষ, বিছানা, জামা-কাপড়, জায়নামাজ, টুপি, তছবি, চশমা সব ঠিকঠাক আছে।
নাকি বাবা উঠানে ঘুরে ফিরছে, বাবা আমাকে ডাকছে, আমি ডাক শুনে বাবার কাছে ছুটে আসছি, বাবা আমাকে আর কি কি করতে হবে? বাবা তুমি আর যাই বলো, আমি ক্ষেতের মাঠে যেতে পারবোনা, ধান আবাদ জমিজমা কখন কি করতে হবে, আমিতো এসবের কিছু বুঝিনা। শুনে বাবা হাসছে, যে হাসির অর্থ- আমিতো আছি বাবা।
কতোদিন তোমার হাসিমুখ দেখিনা।
যখন ফসলের মাঠের দিকে তাকাই, নিজেকে মেলাতে পারিনা। তোমার সেই বিস্মিত হাসি কানে ভাসে। তুমি কতোনা দায়িত্ব পালন করে চলে গেছো। ঘর, সংসার, কর্মজীবন, ছেলে-মেয়ে এবং তাদের ভবিষ্যৎ, জমিজমা, ফসলের মাঠ, ধর্মীয় ও প্রতিদিনের মতো তোমার সুশৃঙ্খল দৈনন্দিন জীবন।
বাবা এবার ঈদে তুমি নতুন জামা-কাপড় পরোনি, ঈদের মাঠে যাওনি, সাথে নিয়ে নামাজ পড়নি। উৎসব আনন্দে-বুকের একাগ্র সান্নিধ্যে তোমাকে কাছে পাইনি।
নামাজ শেষে প্রার্থনায়, বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠছিলো। কোন এক অতৃপ্ত অনুভব, বাবা তুমি কোথায়? চোখের শীতল জল ঝরছে, বাবা তুমি ভালো থেকো।
কবর জিয়ারত শেষে মায়ের কাছে ফিরছি, মাসহ একসাথে খাবো। মায়ের মুখের দিকে তাকাই, মায়ের মুখটা আজ ম্লান দেখাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছিল অবোধ শিশুর মতো মায়ের গলাটা কোন এক শান্তনার বাক্যে জড়িয়ে ধরি, বুকের অনুচ্চারিত শব্দগুলো বেরিয়ে আসুক, তবেই বুঝি শান্তি পাবো। কিন্তু পারিনি। বাবা যখন তোমার কাছে আসি, তখন মনে হয়না- তোমার হাত ধরে দুরন্তপনার বয়স শেষ হয়ে গেছে।
ছুটছি, খেলছি, ডুব সাঁতার কাটছি, নিজ হাতে গোসল করিয়ে দিচ্ছো। এইতো আমি তোমার হাত ধরে প্রাথমিক স্কুলে যাচ্ছি, ফিরছি, দুষ্টুমী করছি। জেদ ধরে ব্যাগ হাতে বাজারে ছুটছি। তোমার দেয়া লাঠি লজেন্স, মিষ্টি, কখনো মেলা থেকে কেনা বাঁশি, প্লাস্টিকের চশমা, ঘড়ি মনে হয় এখনো আমার হাতে।
মা তাকিয়ে দেখছে-তুমি আমাদের গোসল করিয়ে দিচ্ছ, পরনে নতুন জামা কাপড়, চোখে সুরমা, আতরের সুগন্ধি মেখে, তোমার হাত ধরে ঈদগাহে যাচ্ছি নামাজ পড়বো।
বাবা তোমার হাত ধরেই হাঁটতে শেখা, চলতে শেখা, উঁচুতে উঠবার যে সিঁড়ি তা বেয়ে বেয়ে ওঠা তা যে তোমারই শিক্ষা।
বাবা এতোদিন তুমি মাথার উপর ছায়া হয়ে ছিলে।
তোমার পর, বড় ভাইকে শান্তনা ভেবে কিছুটা পথ না এগুতেই ঠিক দু'মাস পর- বড় ভাইয়ের হার্ট এ্যাটাক। নিবিড় সুচিকিৎসায় ঢাকা ল্যাব এইডে বাইপাস সার্জারী করা হলো।
বাবা এখন বুঝতে পারছি, চলমান জীবনের অর্পিত দায়িত্ব। যখন দিশেহারা হই তখন তোমাকে ডাকি, বাবা তুমি আমার পাশে থাকো। বাবা কোন এক অস্তিত্বের অনুভবে, তোমাকে খুঁজে ফিরি বাবা।
পেশাগত জীবনে তুমি দক্ষতার সিঁড়ি বেয়ে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক এন্ড পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলে। বাবা তোমার কাছ থেকে কর্ম ও দক্ষতার উঁচু সিঁড়িতে উঠার অনেক শিক্ষা ও শিক্ষনীয় অনেক কিছুই পেয়েছি।
তুমি অসুস্থ্য। ময়মনসিংহ হাসপাতালে চিকিৎসারত। তোমার সুচিকিৎসার জন্য কতোবার বলি, বাবা- ঢাকায় চলো। নিজ

বসতের মায়া ছেড়ে তুমি আসতে চাওনা ।
শেষাবধি তোমাকে ঢাকা নিয়ে আসলাম । ভর্তি করলাম লালমাটিয়া সিটি হাসপাতালে । তোমার গল ব্লাডারে পাথর ।
অপারেশন, তারপর তুমি কিছুটা সুস্থ্য । ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ একান্তে দীর্ঘ সময় কাটালাম, সেই দীর্ঘ সাড়ে সাত ঘন্টা ।
অনেক গল্প, পরিবার ও সংসার জীবনের । মেনে চলার মতো কতো আদেশ-উপদেশ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত পড়বে, সবার দেখাশুনা করবে, জীবনে চলার পথে তোমার এমন ভালো ভালো কতো উপদেশ ।
নিবিড় পরিচর্যায় তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তোমার আরোগ্যলাভে সেবা শুশ্রুষা করছি ।
বাবা তুমি অনেক অনেক ভালো মানুষ ।
চাকুরী জীবনে অবসরের পর, তোমার চলমান জীবনে তুমি আল্লাহ ও রাসুলের পথে সময় দিয়েছো । তার দেখানো পথে মানুষকে তাবলীগের দাওয়াত দিয়েছো ।
২০০২ এবং ২০১০ সালে তুমি হজ্জ করে ফিরলে । রাসূল (সঃ) এর পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারতের তোমার সৌভাগ্য হয়েছে ।
তুমি জীবনে ও সংসার ধর্মে পরিপূর্ণ, আমাদেরও তোমার শিক্ষার আলোয় পথ দেখিয়েছো ।
২৪ সেপ্টেম্বর । রাত ১১ টার সময় বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে বাসায় ফিরছি----।
গভীর রাত । ঘুম ঘুম চোখে বাবাকে স্মরণ করছি, বাবা তুমি সুস্থ্য হয়ে ফিরে এসো, ফিরে এসো ।
রাত ২ টা । ফোন বাজছে । আমার ছোট ভাইয়ের ফোন ।
ফোন রিসিভ করলাম, "ভাইয়া, বাবাকে আইসিইউতে নিয়ে যাচ্ছে।"
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি, আমার স্ত্রীর চোখে মুখে চিন্তা হতাশার ছাপ, কি হয়েছে?
তারপর স্ত্রীকে খুলেই বললাম, বাবাকে বুঝি আর বাঁচাতে পারছিনা । ভোরে গিয়ে দেখি লাইফ সাপোর্টে ।
হাসপাতালে চোখের সম্মুখে বাবা, সম্মুখে কত স্মৃতি, কতো অব্যক্ত কথোপকথন ।
চোখের লোনা জলে চোখে অস্পষ্ট আকাশ ভাসছে...
২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২, তুমি চলে গেলে দুরে- অনেক দুরে ।
এখন আকাশ ভরা মিটিমিটি জোৎস্না, আমি তাঁকিয়ে আছি দুরের কোন শূন্যতার নীলে । তোমাকে খুঁজে পাবার আশায় ।

শুভেচ্ছা বাণী

শামসুল আলম
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

পৌষের কুয়াশা ঘেরা ভোরে
শিশির ভেজা ঘাসের উপর
মুক্তোদানার মতো
শুভ্র, সুন্দর হোক তোমার জীবন
শুভ হোক কথকতা ব্যাবিলন ।

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
ম্যানেজার, এইচআর এন্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

শ্যামপুর বাজার থেকে কিছুটা পথ হাঁটার পর আমরা নিবিড় নিসর্গের ভেতর প্রবেশ করলাম । মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ির ক্ষণস্থায়ী আনাগোনা বাদ দিলে এটাকে নিবিড়ই বলা চলে । আমার উপর যে পর্বতসমান রাগ জমেছিলো সুশান্তের- তার তেজ কিছুটা কমতে শুরু করেছে । ভোর ছ'টায় আমাদের যাত্রা শুরুর কথা ছিলো । আমার সকালবেলার অনাহুত ঘুম সেই যাত্রাটাকে দুই ঘন্টা দেরি করিয়ে দিলো । দেরিটাই শুধু ওর ক্ষোভের কারণ না । সাড়ে পাঁচটা থেকে শুরু করে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত যতবারই ও আমার সেলফোনে চেষ্টা করেছে- ফোনের ভেতরের মেয়ে কন্ঠ ততবারই সংযোগ দেয়া যাবে না বলে বলে ওকে চরম হতাশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে । বেচারা আজকের দিনটার জন্য মাস তিনেক ধরে প্রতীক্ষা করে আছে ।

মার্চ মাসের প্রথম ভাগ । উঠতি তরুণের তেজ নিয়ে সূর্যটা বেশ ঝাঁঝালো রোদ ছড়াচ্ছে । সেই আলোর পরিপূর্ণ উত্তাপ সুশান্তের চোখে মুখে । সুশান্ত আমার সহকর্মী । ব্যাবিলনে যারা চাকুরী করেন তারা অবশ্য ওকে না চেনার কারণ নেই । আই টি সেকশনের এই সুঠাম ছেলেটি হাসিখুশী এবং নির্মল । গত ডিসেম্বরে ঢাকা মাওয়া রোড ধরে আমার ৬৩ কিলোমিটার পদযাত্রায় ওর সংগী হবার কথা ছিলো । শেষ পর্যন্ত অনিবার্য একটা ব্যাপার স্যাপারে সুশান্ত আমার সংগী হতে পারলো না । সেই থেকে ওর মধ্যে একটা কৌতুহল কাজ করছিলো । ওর সংক্রমিত ইচ্ছাটা বেশ বুঝতে পারছিলাম আমি । সেই ইচ্ছা পূরণের জন্যেই পথে নেমেছি আমরা । হেমায়েতপুর থেকে নবাবগঞ্জ । পথটা দু'জনেরই অপরিচিত । একটা কোনাকুনি রুট আছে এইটুকুই শুধু জানি । বাকিটা পথের উপরেই ছেড়ে দিয়ে হেমায়েতপুর থেকে হাঁটা শুরু করেছি । দু'জনের কাছে দু'টো ডিজিটাল ক্যামেরা । একটার পর একটা ছবি তুলছি । দৃশ্যের পর দৃশ্য বদল হচ্ছে । সুশান্তের চোখে মুখে বিস্ময় । কিছুক্ষণ পর পর তার প্রকাশ ঘটছে । আমি অনেকটা নিঃশব্দ । শুধু ওর কৌতুহলের জবাব দিচ্ছি । আমার ম্যারাথন যাত্রার গল্পটা শোনার জন্য বার বার খোঁচা দিচ্ছিলো সুশান্ত । স্যার আপনি কি সত্যিই হাইট্যা গেছিলেন নাকি বাসে টাসে... । এতো পথ গ্যালেন কেমনে? নবাবগঞ্জের ওই পথের প্রকৃতি এত বিচিত্র যে গল্পটল্প করতে খুব একটা ইচ্ছা করছিলো না ।

পায়ে হেঁটে বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছাটা আমার বহুদিনের । মাওয়া রুট ধরে আমার বাড়ির দূরত্ব ৮৫ কিলোমিটার । এতটা পথ একদিনে হাঁটা সম্ভব না । প্লান ছিলো মাওয়া ঘাট পর্যন্ত একদিনে হাঁটবো । মাওয়াতে রাত্রিযাপন এবং বাকি পথটা পরের দিন । ২৬ ডিসেম্বর সকাল পাঁচটায় বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি । শীতের সকাল । নগরীতে ঘন কুয়াশা । সাড়ে পাঁচটায় যখন জিরো পয়েন্টে পৌঁছালাম তখনও ঢাকা নগরের অন্ধকার কাটেনি । তবে লোকাল বাস আর দু'চারজন যাত্রীর আনাগোনা, হেলপারের হাঁকডাক অল্প বিস্তর শুরু হয়েছে । তবে তা শুধুমাত্র স্টপেজগুলোতেই । একা হাঁটবার জন্য সময়টা খুব বেশি নিরাপদ নয় । দো পেয়ে শিকারিদের জন্য মোক্ষম সময় । আমার বেশভুষা অনেকটা প্রাতঃভ্রমণকারীদের মতো- এটাই যা ভরসা । আগামী পাঁচ তারিখে নির্বাচন । আওয়ামী লীগ, জামায়াত, বিএনপি, হেফাজত- নৈরাজ্যের বাংলাদেশ । খুন, হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও, র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি, মিছিল, হরতাল, ঢাকা মার্চ- এইরকম ক্রান্তি সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে আমার স্বদেশভূমি । কুয়াশার অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে বাবু বাজার ব্রিজ পার হলাম । বুড়িগঙ্গার পানির ওপরেও কুয়াশার ঘন আস্তরণ জমাট বেধেছে । কেরানীগঞ্জ মোড় পার হবার পর বিশাল একটা ফাঁকা জায়গা । জনমানবহীন এই ভবিষ্যৎ আবাসন প্রকল্পের কাশবনের ভেতর দিয়ে আমাকে বিশ্বরোডে উঠতে হবে । একবার ভাবছিলাম- ফিরে যাই । কিন্তু তার তো আর উপায় নাই । ঢেরা পিটিয়ে রাজ্যের

মানুষকে জানান দিয়েছি আমার হন্টন যাত্রার কথা । ওরা তো সবাই কাপুরুষ ভাববে । পৌরুষে আঘাত! অনন্যোপায় প্রাতঃভ্রমণের ছদ্মবেশ নিলাম । গুটি গুটি দৌড়ে জগিং করতে করতে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পার হয়ে বিশ্বরোডে উঠলাম । ঢাকা-মাওয়া-খুলনার বিশ্বরোড ইতোমধ্যে অনেকটাই ফর্সা হয়ে গেছে । অন্তত আমার আপাত নিঃসঙ্কোচ হবার মতো । রাস্তায় হালকা পাতলা যান চলাচল এবং দু'একজন শ্রমজীবি মানুষের পদচারণায় আরো কিছুটা সাহস ফিরে পেলাম । এই পথে বাসে করে যাতায়াতের সময় ঘন ঘন বাজার চোখে পড়ে । আব্দুল্লাহপুর, নিমতলী, শ্রীনগর আরো অসংখ্য নাম দেখি দোকানের সাইনবোর্ডে । অথচ আজকে হাঁটবার সময় সেই কোলাহলপুর্ণ বাজারগুলো দুরে সরে গেছে মনে হয় । এটাকে ইলুসন না বলে গতিভ্রম বলা চলে । চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার গতির একটা বাসের সাথে পাঁচ-সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার গতির একজন মানুষের পার্থক্য বলা যায় এটাকে । মাওয়া সড়কের দুইপাশ বেশ খাড়া । পাশের খাদগুলো বেশ গভীর এবং জলমগ্ন । পদ্মা এবং মেঘনা অববাহিকার এই অঞ্চল অনেকটাই নীচু- বর্ষায় জলমগ্ন থাকে বেশ কয়েকমাস । তখন এর মোহনীয় রূপ শীতের রুক্ষতার মধ্যেও লাবণ্য হারায় না । রবিশস্যের বৈচিত্র্য, বিল, নদী, খাল এই মহাসড়কের যাত্রীদেরকে দৃষ্টিসুখ দিয়ে চলে সকল ঋতুতে। আমার জন্যেতো এটা একটা বাড়তি পাওনাই বটে ।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় শ্রীনগরের নিমতলী বাজারে পৌঁছলাম । চায়ের ভীষন তেষ্টা পেয়েছিলো অনেক আগে থেকেই । হাঁটার নেশা থেকে ছুটতে পারছিলাম না । একটু বিশ্রামের চাহিদা টের পেলাম । এক কাপ চা বিরতি- সাথে হালকা নাস্তা । আবার হন্টন । যতোটা দ্রুত পারা যায় ।

সুশান্ত আমার হাঁটার গল্প শুনছিলো । মাঝে মাঝে তার কৌতুহলী আর বোকাসোকা প্রশ্ন আমাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছিলো । এরকম আগ্রহী শ্রোতাকে গল্প বলে বেশ মজা পাওয়া যায় । গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ছবি তুলছিলাম । ফুল, পাখি, লতা-পাতার, সবুজের, মাঠের, ফসলের । শেষ বসন্তের রোমান্টিক দিনে নবাবগঞ্জের অপরিচিত রাস্তায় এত সৌন্দর্যের পসরা সাজানো থাকবে আমরা ভাবতে পারিনি । নিমতলীতে আমার চা নাস্তার গল্পে সুশান্তের পাকস্থলী নড়েচড়ে উঠলো । আমারও ক্ষিধে লেগে গেছে । পাকা তিনঘন্টা হাঁটা হয়ে গেছে আমাদের । আমরা বেশ বড়সড় একটা নদীর কাছে পৌঁছে গেছি । একটা সুদর্শন সেতু এর দুই পারের সাথে সন্ধি পাতিয়েছে । ইটাভারা ব্রিজ । বংশী নদীর উপর । চওড়া নদীর পুরোটা জুড়ে কচুরীপানার দঙ্গল বিগত যৌবনা বংশীর সুরলহরী থামিয়ে দিয়েছে । সীমাহীন কচুরীপানারও সৌন্দর্য আছে । রূপালী জলের পরিবর্তে বংশীর সবুজে শরীর দেখতে দেখতেই জেলী আর আমির ব্রেডের পাউরুটি দিয়ে নাস্তা সেরে নিলাম দু'জন । হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত শরীর অমৃতের স্বাদ পেল । আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম । সুশান্ত আমার ডিসেম্বরের সেই মহাযাত্রার বাকি গল্প শুনতে চাইলো ।

নিমতলীতে সামান্য বিরতির সময়ই আমি সিদ্ধান্ত বদল করি । দুই দিন পথে পথে নষ্ট করার মানে হয় না । একদিনে যতদুর যাওয়া যায় এ যাত্রায় সেটাই সম্বল হোক । রাস্তার মাইলস্টোন সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতোমধ্যে আমি প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার পথ পার হয়ে এসেছি । মাওয়া ঘাটের দুরত্ব এখান থেকে বার কিলোমিটার । কুয়াশা অনেকটা কেটে গেলেও সূর্যের খুব একটা তেজ নেই যা হাঁটার জন্য ক্লান্তি আনতে পারে । হাঁটতে হাঁটতে একটা ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে আমার মধ্যে । হাঁটার ছন্দ । জিরো পয়েন্ট থেকে সাড়ে সাত ঘন্টা পা চালিয়ে দেড়টার দিকে আমি মাওয়া ঘাটে পৌঁছলাম । মাওয়া ঘাটে পৌঁছে আমার সাবেক সহকর্মী লুৎফরকে ফোন দেয়ার কথা ছিলো । ওর বাড়িতেই রাতের আশ্রয় গ্রহণের কথা । ওকে আর ফোন দিলাম না । সোজা স্পিডবোট ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলাম । যত দ্রুত সম্ভব নদী পার হয়ে হাঁটা শুরু করতে হবে । মুহূর্তকাল সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই । শীতের স্বল্প দৈর্ঘ্যের দিন । অনেকটা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মতো । স্পিডবোটের জন্য অপেক্ষমান যাত্রীর দীর্ঘ লাইন পড়েছে । ঘন কুয়াশার কারণে বারটা পর্যন্ত নদী পারাপার বন্ধ ছিলো । সকাল থেকে জমে যাওয়া যাত্রীর একটা বিশাল জট মাওয়া ঘাটে । কিন্তু আমার যে দেরী করার সময় নেই । অল্পক্ষনের মধ্যেই কিছু লাইন বিমুখ সগোত্রীয় মিলে গেলো । পেছনের ঘাট দিয়ে একটা বোটম্যানকে বাড়তি ভাড়ার লোভ দেখিয়ে রাজি করালাম আমরা । কাওড়াকান্দির দিকে একরকম উড়াল দিলো স্পিডবোটটি ।

আমার গল্প শুনে শুনে আফসোসের আর শেষ নেই সুশান্তের । স্যার কেন যে আপনার সাথে গেলাম না । একটা জটিল অভিজ্ঞতা হইতো । আজকের যাত্রাটা কেমন লাগছে সুশান্ত? আমি জিজ্ঞেস করলাম । জটিল, হাঁটতে যে এত মজা পাওয়া যায়, আর এই পথটা যে এত সুন্দর না আইলে তো বুঝতেই পারতাম না । একটা মাছরাঙার ছবি তোলার চেষ্টা করতে করতে সাথে আরো কিছু বিশেষণ জুড়ে দিলো সুশান্ত । ইটাভারা ব্রীজ থেকে টানা হেঁটে এসে আমরা একটা বড়সড় বাজার পেলাম । হযরতপুর বাজার । হাটের দিন বলে লোকজনে সরগরম । আমাদের ব্যাগের বিস্কুট, চকলেট, পানি, কোক হাঁটতে হাঁটতে সব খেয়ে ফেলেছি । কিছুটা রসদ যোগাড় করা দরকার । হাটের ভীড় ঠেলে কেজিখানেক ক্ষীরা, এক বোতল পানি আর আধা

লিটার নরম পানি নিলাম। রোদের ভেতর হাঁটতে যতটা সম্ভব পানির যোগান দেয়া প্রয়োজন শরীরটাকে। দু'একজন হাটুরের কাছ থেকে পরবর্তী পথের বিভ্রান্তিটা দুর করে আবার হাঁটতে শুরু করেছি। দু'শ মিটার মতো হাঁটার পর সুশান্ত একটা লাফ দিয়ে চেচিয়ে উঠলো- 'স্যার আপনি আমারে কৈ লইয়া আইলেন!' নীল জলের একটা অসম্ভব সুন্দর নদী আমাদের সামনে। তার পাড় সুন্দর, তল সুন্দর, জল সুন্দর। সুশান্তের চোখ উদ্বেলিত, মুখ বিস্মিত। আমি বললাম- কালীগঙ্গা, কালীগঙ্গা ছাড়া হতেই পারে না অন্য কোন নদী। নদীর চেহারা দেখে, তার ভূগোল অনুভব করে আমি নিশ্চিত। নদীপাড়ের একজন মানুষের কাছে সুশান্ত এ নদীর নাম জিজ্ঞেস করলো। সে বললো কালীগঙ্গা। আমি লাফিয়ে উঠলাম। সুশান্ত বলল- চিনলেন ক্যামনে? আমি বললাম- শরীর দেখে। এরপর সেই স্বপ্ন নদীর ভেতরের পাড় ধরে আমরা দু'জন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁটলাম। ছবি তুললাম। জলকেলি করলাম। সুশান্ত কিছুক্ষণ পর পর বলতে থাকলো- স্যার আপনি আমারে কৈ লইয়া আইলেন। নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন পাড়গ্রাম বাজারে পৌঁছলাম তখন ভরদুপুর।

পাড়গ্রামের নদীর পাড়ে আমাকে বসিয়ে রেখে বাজারে ঢুকলো সুশান্ত। কিছুক্ষণ পর ফিরলো দু'টো গামছা নিয়ে। বললো- এই নদীতে গোসল না করে যাওয়া যায় না। আমি বললাম- কালীগঙ্গা বলে? ও হাসলো। গঙ্গা বলে কথা। ব্যাটা হিন্দু কোথাকার। ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। নেমে পড়লাম নদীতে। এই জল স্বর্গ থেকে আগত। এই জল শীতল। এই পানি নিটোল। কালীগঙ্গার শানবাঁধানো ঘাটে প্রায় আধা ঘন্টা ধরে আমরা জলের কল্লোল তুললাম দু'জন। ঘাটের মানুষের সাথে আলাপ হলো। আমাদের পদযাত্রার কাহিনী শুনতে ভীড় বাড়লো। মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানালো কয়েকজন। সে আমন্ত্রণের মধ্যে কোন প্রিজারভেটিভ নেই। কোন ভনিতার বালাই নেই। সরল সুন্দর আম জনতার কাছ থেকে আমরা পরবর্তী পথের একটা ধারালো ধারণা নিয়ে কোন্ডা গুদারাঘাটের খেয়া পার হবার জন্য হাঁটা শুরু করলাম। সাদা মাটির মোহনীয় পথ। আকানো বাঁকানো, আমাজান নদীর মতো। শেষ বসন্তের সমস্ত অনুষঙ্গের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিমুলের আরক্তিম ডাল, চরের মাটিতে ডগডগে ফসলের ক্ষেত, হলুদিয়া পাখির সাথে দেখা হলো। গুদারাঘাটের টলমলে জলের ভেতর দুরন্ত বালক-বালিকার কল্লোলিত ডুব সাতার আমাকে বহুবছর পেছনের শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো।

রাই সর্ষের ক্ষেত সকালে উজ্জ্বল হ'লো-
দুপুরে বিবর্ণ হয়ে গেল
তারিপাশে নদী;
নদী, তুমি কোন্ কথা কও?

জীবনানন্দের মতো আমিও উত্তর খুঁজতে থাকি। গুদারাঘাটের বৃদ্ধ মাঝি তারাপদ মন্ডল আমাদের পার করে নামিয়ে দেন একই নদীর অন্যরকম রূপ বৈচিত্রের ভেতর। এই পাড়টা অনেক উঁচু। খাড়া পাড় বেয়ে উপরে উঠে আমরা প্রায় বিশ ফুট উঁচু মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। নদীর বাঁকটা এখান থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। দৃষ্টিসীমার শেষ দিকে একটা রূপালী চুলের মতো তার দেহ একসময় মিলিয়ে যায়। হযরতপুর থেকে প্রায় সাত/আট কিলোমিটার পথ কালিগঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে এ নদীর সাথে সখ্যতা গড়ে উঠেছে টের পাইনি। পথের প্রয়োজনে এখন তাকে ছেড়ে যেতে হবে। ডানদিকে নদীটাকে রেখে আমরা ধীরে ধীরে বায়ের দিকে পা বাড়ালাম। সাদা মাটির আলপথ ধরে নানারকম রোমান্টিক অনুষঙ্গের ভেতর আরো প্রায় চার কিলোমিটার হেঁটে পিচ ঢালা পথে উঠলাম। এই পথ ধরেই সোজা চলে যেতে হবে নবাবগঞ্জ। সূর্যের তেজ বেড়ে যাম ঝরাচ্ছে শরীরে। পিচের রাস্তায় উত্তাপ দ্বিগুন। পেটের ভেতরেও আগুন ধরেছে ক্ষুধায়। তবুও হাঁটতে খারাপ লাগছে না। এই লাইনের ডেবুন্টান্ট সুশান্তের পারফর্মেন্স অসামান্য। পাকা রাস্তায় দুই কিলোমিটারের মতো হাঁটার পর একটা ছোট্ট বাজার পেলাম। একটা খাবারের হোটেল পাওয়া গেলো। বেশ বাড়ির মতো পরিবেশ। দোকানের পেছনে বাঁশবাগানের নীচে একটা টিওবওয়েল- হোটেলেরই সম্পদ। হাত-মুখ ধুয়ে আয়েশ করে পেটটাকে শান্তি দিলাম। মুরগীর মাংস আর লাল শাক। শেষে দু'কাপ রং চা। এ ধরনের হোটেলের খাবারদাবারে বেশ পারিবারিক স্বাদ থাকে। দামটাও হয় স্বস্তিদায়ক। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো উল্টো। ক্ষতিটাকে পুষিয়ে নেয়ার জন্য হোটেলের বেঞ্চে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উত্তপ্ত পথে নেমে পড়লাম আমরা। রাস্তাটা সোজা হয়ে অনেকটা দুর চলে এসেছে। বড় বড় গাছের ছায়া কিছুটা স্বস্তি দিলো। সুশান্ত আমার ম্যারাথন হাঁটার বাকি গল্প শুনতে বার বার তাগাদা দিচ্ছে।

মাওয়া থেকে কাওড়াকান্দি। এই নদীপথের দুরত্ব আট কিলোমিটারের মতো। প্রথমে মূল নদীটাকে আড়াআড়ি পার হয়ে তারপর পাড়ের সমান্তরাল একটা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে পঁচিশ মিনিটের পথ পাড়ি দিতে হয়। চরের সৌন্দর্য এখানে অসাধারণ। পানির উপর ভাসতে থাকা সিগালগুলো অন্যরকম উপঢৌকন। ঘাটে নেমে কিছু রসদ যোগাড় করলাম। একহালি কমলা, গোটাচারেক

ঢাউস সাইজের সফেদা আরও কিছু হালকা পাতলা খাবার দাবার। কিছুতেই ব্যাগ ভারী করা চলবে না। ব্যাগে এক লিটারের একটা কোক, হাতে এক লিটারের একটা পানির বোতল। শরীরে গ্লুকোজের যোগান দেয়াটা জরুরী। চকলেট, সফেদা কিংবা স্প্রাইট এক্ষেত্রে কার্যকর। গোটাচারেক ওরস্যালাইন নিয়েছিলাম ব্যাগে। মাঝে মধ্যে পানির সাথে গুলিয়ে খেয়ে বেশ উপকার পাওয়া গেছে। মাসল ক্র্যাম্পের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্যালাইন বেশ কার্যকর। ডাঃ কাওছারের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার। যাত্রা শুরুর আগ থেকেই সম্ভাব্য শারীরিক ঝুঁকির প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক পরামর্শ সবই তার কাছ থেকে পেয়েছি। তার পরামর্শ মতো প্রয়োজনীয় ওষুধগুলোও ব্যাগে সংরক্ষণ করেছি আগে থেকেই। কাটায় কাটায় দুইটা। কাওড়াকান্দি ঘাট ছেড়ে হাঁটতে শুরু করলাম। এখান থেকে ভাঙ্গা মোড় পর্যন্ত চব্বিশ কিলোমিটার পথ। ভাঙ্গা থেকে আমার বাড়ি আরো প্রায় সতের কিলো। হাতে যে সময় আছে তাতে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো কোনক্রমেই সম্ভব না। আমার আপাত গন্তব্য তাই ভাঙ্গা মোড়। জিরো পয়েন্ট থেকে ষাট কিলোমিটার। কিছুক্ষণ আগে সামান্য রোদের ঝলক দেখা দিয়েছে তবে তা তেজহীন। হাঁটার জন্য এই রকম আবহাওয়া বেশ উপযোগী। মহাসড়কের দুই পাশে সবুজের নানারকম শেড। কুয়াশা ফুড়ে বেরিয়ে আসা রোদের আলোতে উজ্জ্বল প্রান্তর। নদীর ওপারে আমার যে গতি ছিলো তা কিছুটা কমে এসেছে। রাস্তায় গাড়িটাড়ি একদম নেই। আধা কিলো দুরে দুরে দু'জন করে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রী ফিরছেন এই পথে। জায়গায় জায়গায় নেতা-কর্মীরা জড়ো হয়েছে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাতে। যানহীন মহাসড়কে রাজার মতো হেঁটে চলেছি একা আমি। আড়িয়াল খাঁ ব্রীজ (হাজী শরীয়তুল্লাহ্ সেতু) পার হওয়ার সময় মন ভরে নদীটাকে দেখলাম। তেজী নদী। তবে বর্ষায়। এখন সুবোধ বালকের মতো- ঘুমিয়ে আছে। তার মোহন রূপে চোখ জুড়ালো। দু'জন জেলের সাথে হাঁটছি। আড়িয়াল খাঁ থেকে মাছ ধরে সামনের সূর্যনগর বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছিলো ওরা। ওদের সাথে হাঁটলাম সূর্যনগর পর্যন্ত। কথায় কথায় আমার হাঁটার কাহিনী শুনে আশ্চর্য হলো ওরা। অনিল আর অধর মাঝির কথা মনে থাকবে অনেকদিন। আমার হাঁটার স্বীকৃতি দিতে এক কাপ চা না খাইয়ে ওরা আমাকে সূর্যনগর ছাড়তে দিলো না।

আমার বাম পায়ের পাতার সামনের দিকে ব্যথা অনুভব হচ্ছিলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ব্যথাটা এখন বেশ বেড়ে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ডাঃ কাওছারকে ফোনে জানালাম। ডাঃ আমাকে পায়ের তলাটা কিছুক্ষণ ম্যাসেজ করে নিয়ে আবার হাঁটতে বললেন। বললেন- রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা হচ্ছে সম্ভবত। সূর্যনগরের পরের বাজারে একটা চা দোকানের বেঞ্চিতে বসে জুতো থেকে পা বের করে ম্যাসেজ করলাম। জায়গাটাতে একটা কালচে দাগ দেখা গেলো। মিনিট দশেক পরে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। ব্যথাটা কিছুটা কম মনে হলো। রাস্তার পাশের হলুদ সর্ষে ক্ষেতের উপর বিকেলের আলো পড়ে আভা ছড়াচ্ছে। সে আলো ক্ষেতের মধ্যে চরে বেড়ানো অথবা শিকারের জন্য ধ্যানমগ্ন বকেদের ধবল পালকেও পড়েছে। দুরবর্তী গ্রামগুলোর কালচে সবুজের উপর কুয়াশার এক একটা রেখা তৈরী হয়ে আছে। আরো বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যখন মালিগ্রাম বাজারে পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা নামতে চললো। পায়ের ব্যথাটা একটু একটু আবার বেড়ে যাচ্ছে। কুয়াশার আস্তরণ গাঢ় হয়ে গেছে এরই মধ্যে। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো রাস্তার দু'পাশের গাছের ভিতর দিয়ে পড়ে আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলছে। এই ক্ষীণ আলোয় চলতে চলতে আটটার দিকে ভাঙ্গা মোড়ে পৌঁছালাম। পায়ের নীচে ফোস্কার মতো ক্ষত বেশ কষ্ট দিচ্ছিলো। একটা খাবার হোটেলে বসে আরেকবার ম্যাসেজ করলাম। রাস্তা এখানো জনশূন্য হয়নি। আরো ঘন্টাখানেক পা চালানো যেতে পারে যদি পায়ের অবস্থা আরো খারাপ না হয়ে পড়ে। ভাঙ্গা মোড় থেকে বা দিকে ঢাকা-বরিশাল রোড ধরে আমার বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। শ'খানেক গজ যাওয়ার পর আনোয়ারের সাথে দেখা হলো। আমার এলাকার ছোট ভাই আনোয়ার। একটা মোটর গ্যারেজে ওর বাইকের কি যেন একটা পার্টস লাগাতে এসেছে। আমার যাত্রার বিবরণ শুনে ও হতভম্ব। আপনার আর হাঁটার দরকার নাই। কিছুক্ষণ বসেন। বাইকটা ঠিক হলে আপনি আমার সাথে যাবেন। বলে একরকম জোর করে বেঞ্চে বসিয়ে দিলো ও। আমি বললাম- তুমি বাইক ঠিক করে আসো, আমাকে রাস্তা থেকে তুলে নিও। আরো তিন কিলোমিটার হাঁটলাম। পায়ের নীচের ক্ষতটা দগদগে আকার ধারণ করেছে। একটা দোকানে বসে আনোয়ারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পা দুটো ভারী হয়ে আসছিলো।

সুশান্তকে গল্প শোনাতে শোনাতে কখন যে নবাবগঞ্জ পৌঁছে গেছি টেরই পাইনি। কলাকোপার প্রাচীন বাড়িগুলোর কারুকাজ দেখতে দেখতে ইছামতি নদীর পাড়ে আনছার ক্যাম্পের বাঁধানো বেদীতে বসে শরীর এলিয়ে দিয়েছি আর গুনগুন করে গাইছি- ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু...। ইছামতির পানিতে শেষ বিকেলের আলো পড়ে অদ্ভুত বিচ্ছুরণ ছড়াচ্ছে। সুশান্ত শুয়ে শুয়ে তার ছবি তুলে চলেছে -

Let's Give It A Try

S M Emdadul Islam
Director
Babylon Group

Writing for the ninth publication of Babylon Kathokata is going to be a lot easier for me this time. I choose the easiest subject for me to try my piece. It's not a story that I have to churn out overriding the capacity of my brains, nor a work of poetry. I am going to tell my readers (hope I have some) about something that float in my mind like the white patches of clouds do in an autumn sky. These thoughts never leave me alone. Not an absolute truth. They stand by whenever my mind is busy doing other things like busy working, listening to music, watching a movie, reading a book or having a pleasant time together with people I love and care for.

My reader (hopefully readers) is now wondering what is it all about! Why can't this guy come straight to the point? This is actually a ploy. Since the matter that I want to write about or tell you about is very simple I am just trying to make it look like something special, something worth your time.

Well! It's about life-human life for that. (Not that the other forms of life don't intrigue me. They do but I want to observe my quota of number of words for this article and keep it short)

Like millions or probably billions of other people I wonder why we are born at all? When I ask this question to myself I certainly exclude humans of super quality. Scientists, discoverers, reformers, masters of arts & crafts, super athletes & people in the sports, people who sacrifice their lives for the diseased and distressed etc. They are most desirable and heroes to the mankind.

I talk about people like me, the ordinary ones. We are the ones who fill the surface of the earth and consume most of the natural and man-made resources.

They say everyone is born to serve a purpose. What that purpose may be? Be born, drink, eat, play, receive formal education to some extent, become a clerk, a salesman, a hawker, get married some day, raise a family that we can't well support, suffer from diseases from time to time and if we are lucky die a natural death when we are sufficiently old? Is this good enough? Worth being born and living our lives for? The answer can be hardly affirmative. While most of us actually live like that we really don't want to accept that kind of mundane life for ourselves.

Then what can we do about it?

Here I choose to borrow an idea from one of Dale Carnegie's books. He advised his readers something like-If you can't be a big tree on the top of a hill and if you are just a blade of grass on a valley then try to be the best of it. Whatever you are-be the best of it. If you are a typist or a cleaner- be the best of them.

This of course is for us to become best in our professional lives. If we really can take the meaning of it in the core of our heart then all on a sudden we can stop worrying about not being a famous scientist or an engineer, doctor, lawyer or a very successful businessman. We can derive lots of pleasure from being the best of what we actually have become.

But even if I become one of the best carpenters or a clerk or a schoolteacher, a nurse, a sales girl yet at some point in time of my life I may sit still and try to get an answer for myself. Am I successful? A good man? Am I

respected by those who know me? By my wife, husband, son, daughter, brother, sister, friends, colleagues, neighbors? Most importantly by people who are my subordinates like the domestic help, the security guards, cleaners, lift man, gardener, the errand boy, the driver of my car, the rickshaw puller who pulls me, the grocer, my dependents?

This definitely is a big question, a difficult question to get an answer to. Probably in many cases the answers are not so affirmative. Problem is that we, no matter who we are- whether a very successful one, a mediocre or just one ordinary being of billions of people, often don't realise what we do in treating people that we live with, work with, associate with, come across in our daily life or in special occasions. We treat them very unkindly sometimes and with rudeness. That we do unconsciously most of the time. We remain totally unaware of these acts of ours. Unfortunately most people don't complain to us about our misdemeanour or mistreatment of them- sometimes out of fear, sometimes out of lack of taste etc. But that doesn't refrain them from sharing these with fellow people in gossips. So we are portrayed to others accordingly. Often that portraiture gets some extra colours that we actually don't deserve.

Our education, upbringing, social position even common sense should be able to tell us that we need to take care of this for us to be a nice human being irrespective of whether I am a super breed or medium breed or an ordinary one. A billionaire or a super scientist or a super successful human in any discipline of trade or occupation consciously won't like to be hated or disliked or less liked by fellow human beings. But still it happens, and happens a lot. Despite our mental, intellectual and professional superiority we treat people wrongly, do things to them that we are not supposed to do and don't do things that we are supposed to do. We do things that we don't like to be done upon us by other fellows. We never learn to 'Be in other people's shoes'. How simple it sounds that if you don't like certain treatment for yourself then how easily it must apply to others in a similar fashion!

If we feel happy when somebody says that he is sorry because he has done some wrong to us or if someone thanks us for some of our actions then why not we be able to return the same gesture to others on similar occasions when the condition reverses?

In our society parents of kids, teachers at schools can be very forgetful about their own times in their childhood. They seem to totally forget the facts that how they resented their parents or hated their teachers when they were treated unkindly or with less consideration by them. How can we forget that and carry on with the legacy of tyranny upon our young folks? Why can't we, at times, reflect on our own childhood and select our mode of behavior with our children in accordance with our own liking and disliking?

One other thing that is seen quite often in our society in plenty of cases is that the married women get treated very badly and humiliated mercilessly by their mothers-in-law in tandem with their husbands' sisters. The reason could be that these mothers-in-law also got same to come to them by their respective mothers-in-law. So they just pass it on often without giving it a proper thought that they could change this tasteless and inhuman practice and set a new trend of treating their daughters-in-law with proper respect and dignity what they expect for their own daughters to get from their mothers-in-law when they are married off. This, once practised en masse, could have a profound positive effect on the society.

Coincidentally today is a day of celebration- Eid ul Fitre. See how we change on special days like this one, Christmas day or a Dewali or anything of this kind! We transform ourselves for the day so much. We become so nice, kind and tolerant and also generous in offering gifts and tips among the poor and needy. On those days we treat them all nicely and equally irrespective of their social positioning. The irony is that we change only for the day. We can't or don't continue the same kindness and pleasantness for others beyond that day. How do we define this behaviour? A kind of hypocrisy? If it is, then why? If we can do it for a day then why can't it be

for all the other days too? I don't suggest that we give away gifts or monies everyday. But we can be at least nice, kind, sympathetic, courteous everyday, every hour, every minute. Without spending a penny thus we can bring cheer to so many unaccustomed hearts. Why can we not try to do all of these from this very minute?-

1. Practise thanking others when they deserve one.

2. Say 'Sorry' when we have to- even to our juniors or someone at the lowest rung of the social hierarchy if a situation so demands.

3. Admit our mistakes before others know about them from elsewhere. Mistakes, those can affect other people's lives and businesses.

4. If we love, adore, respect someone then we tell him (her) so now before it is too late. Tomorrow may never come. (This makes you remember Sir Frank Peters, right? I am an admirer of Sir Peters, a wonderful gentleman with an enviable heart inside his chest).

5. Try to keep our patience even on a most provoking situation. Remember we are least rational when we are angry. Anger leads us to making wrong steps, which we regret later but in vain.

6. Loving, caring, respecting, being courteous, helping others are some of the things that can be most rewarding for us ordinary people. We can do it for our own benefits.

7. When we think we are dealing with a less reasonable and less intelligent person it is on to us to be reasonable and practise our tolerance at that moment. Knowing about other people's limitations and acting accordingly with patience and sympathy is a virtue.

8. Being selfless and prioritising other people's interests can in the end bring lots of gains for our own selves.

9. Try to earn respect from others out of their love and affection, not fear.

10. Possess an attractive personality even if we don't possess material possessions. Honesty, integrity, selflessness, kindness, politeness, etc in ourselves can help us possess that kind of personality.

11. Not to miss a chance to help others if we can. Helping others is like planting a sapling. This can grow over time to bear fruits for our children and us at the time of need. People don't forget favours or disfavours for them to respond to in future according to what they receive from others at the time of their need.

12. Not to show impatience to elderly people when they show sloppiness at home or in public places. We have to understand that these people were young once like us and we too are supposed to grow old and weak someday. We are not to look down upon the physically or mentally challenged people or to the ugly faces. One should remember they are not generally responsible for their looks or physical and mental imperfections. If I am not like one of them then I could well have been.

The above are just some of the practices that we common people can practise to remain lovable in the society and be remembered. We should do this for our own kids, wife, siblings, friends and associates and thus give them some good reasons for them to remember us when we are no more. Is this not a great feeling if we can truly believe that others who know us talk amongst themselves about us saying that we are nice fellows?

Friends Are Forever

Sohely Suraiya Sadeque
Officer, Merchandising & Marketing
Woven Tops, Babylon Group

I visited the Trade Fair last week. The sole purpose of the visit was to take my little sister out. My mother and my sister were staying in our place for the last few days. As my husband & I both were service holders, we found it very difficult to manage time together to take them somewhere for an outing. So my sister must have been passing a very boring time though she wouldn't admit.

To solve this problem, on Friday we three left home at 4 pm for the Trade Fair at Agargaon and reached our destination safely in 20 minutes time. I was expecting a long queue in front of the ticket counter and also a large crowd in front of the entrance, as it was a weekend. Before we got down from the bus, I could see my fear about the crowd was true. When we were near the ticket counter my husband told us to wait and he went to buy the tickets. To my surprise he returned just in 15 minutes. Maybe that was the reason why the crowd also became tolerable to me.

As we were entering through the gate a wild cacophony of different sounds hit my eardrums. It was a mixture of thousands of people's conversations; product advertisements, announcements, music etc. Yet I felt very happy watching joyful people all around. Dancing and cheering kids, different stalls with eye catching architectural beauty, decorative lights, flowers etc could always take all your worries and sorrows away, at least momentarily.

My little sister did not waste a minute to start taking snapshots with her cell-phone camera. She took photos of the big "Curzon Hall" shaped gate, the joyful crowd inside the fairground, balloons of different shapes and colours, beautifully done illuminations, flower-beds, and of course of different attractive stalls. All those stalls were different from one another and each was a stunning beauty. There were also hawkers with so many things to sell.

We decided to visit a stall, a structure made in steel to offer household products for the visitors. My liking for the stall was not because the merchandise they showcased. It was because the stall was made very attractively in stainless steel, shiny glass sheets and other materials. The stall was a two-story building with glass walls. Inside the structure there were hundreds of tiny light bulbs of different colours put hanging from the metal rods stuck to the ceiling. The interior was very lovely. My little sister captured photos of that stall from different angels.

Then we decided to visit a furniture stall. It was also a two-storied one. And it was at the entrance where we met my friend. Actually I didn't notice her at first, it was my sister who drew my attention to her and

exclaimed - wasn't she.....? That was the time when I noticed Jasmine, one of my bosom friends from school time. I hurried toward her and hugged "J a s m i n e! Is it you?"

"My goodness, it is Sohely! After so many years! Is this Rupa? See how you have grown up!" she burst into joy.

"Who else came with you?" I asked her.

"My brother Zico, I hope u remember him" she replied, "my husband and my daughter."

"Where are they? I want to meet. Please call them." I implored her. I couldn't believe that she was a mother of a two and a half year old girl! She still looked like the same age as she was in college with me. Jasmine called her husband. We met each other. Her husband was a good-looking young man with a dark complexion. And her daughter was like a little angel.

When I left Bogra 8/9 years back (during my first year at college) cell phone didn't become that popular among college students as it was nowadays. That was the reason why I lost touch with many of my friends specially those who got admission in different other departments. Jasmine was one of them. We were very close in school but after completing school period our social touch was less, as we took different subjects as major in college. But we had interactions in-between two classes, as we used to pass leisure time together at the common room (waiting room for girls).

Jasmine was also very happy to see us (me, my sister and my husband). She lived in Narshingdi with her husband and daughter and came to Dhaka to visit the Trade Fair. Now they were putting up at Zico's place. Zico had completed graduation from IUB (Independent University of Bangladesh) and now was trying to get admission in North South University for MBA. I invited Jasmine to come and stay with us as mother was here and she would love to meet her. She thanked me for the invitation but said unfortunately she had to leave the town the next day and wouldn't have time to meet mother this time. She then promised to visit us in the near future. We exchanged our contact details and bade farewell to each other.

The sudden encounter with one of my dear friends from the past had added enormously to my enjoyment in the fair ground. I wondered whether she also had the similar feeling toward me or not.

As if reading my mind Jasmine sent me a little text message the following day. The message read "kisu kotha omolin, kisu betha simahin, kisu chaoa sarthohin, na hok dekha protidin - tobu mora bondhu robo chirodin". (Some words are never forgotten, some pains are unbearable, some wants are selfless, never mind if we don't meet often, let's remain friends forever.)
Reading that message I felt inside my heart that her feeling for me was no less than my feelings for her...

Friendship is the strangest kind of relationship in the world. I think like this because, the basis of this kind is nothing but unconditional love. Two strangers can come very close to each other's heart with this relationship and can have a strong invisible tie between themselves, which is no less than any blood relation.

Visiting the Dreamland, United States of America

Muhammad Saiful Hoque
Asst General Manager, Marketing & Merchandising
Woven Tops, Babylon Group

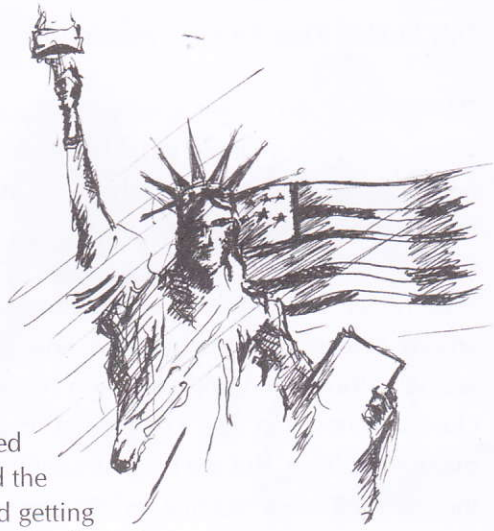

I never liked to participate in any kind of lottery. When the DV lottery was offered by US government for the Bangladeshis I was considering whether I would compromise with my lottery principle. I had a strong but silent desire to see and settle down in USA or England (if possible) since I was a student. DV lottery could be the easiest way to fulfill my dream if luck would favor. I passed the total time period for DV application only thinking about it but eventually failed to act upon it. After the time was over I accepted that one more of my dreams would remain unfulfilled, as I knew the difficulties of getting US visa. One of my friends, who was from a wealthy family succeeded to get the US visa only after trying 6 or 7 times when I was studying in the University. My friend is well established now in USA. However, I got an opportunity when Perry Ellis country director, Mr. Vinay Arora insisted me on visiting their US office for more business. I requested him to send the invitation letter but I never thought that he would do it so quick. I started getting thrilled as the dream of student life got revived. I got the visa within a week submission of my application. I planned my visit to USA from 31st Aug to 14th Sept'14 after taking management approval. The meeting with Perry Ellis, Weatherproof and V.F. Asia (Nautica) was set a month ahead of the trip.

I flew from Dhaka on 30th Aug evening and reached New York on 31st Aug'14 morning. One of my uncles, Sadiur Rahman, was waiting outside the airport for me. It took nearly two and a half hours to complete the immigration & customs for a very long queue after landing. The immigration officer didn't take more than 3 minutes for issuing me arrival entry as a first time traveler in USA. I saw Sadi kaku after 18 years, who came to USA in 1996 getting the DV lottery. He is now well settled in New York. He took me to his home first from the airport though I was insisting him to drop me to my hotel. I was very tired after more than 24 hours journey including 19 hours flying time in the sky but got relaxed after having my favorite food cooked by aunt at home. Then my uncle and aunt decided to take me to a picnic of Rangpur Jella Samitee on the same day. We started after half an hour rest to attend the picnic which was 20 miles away from the home. After reaching the spot we realized that the authority won't allow us entering because the permitted limit of the people had already crossed. I saw the organizers to request the authority for consideration but could not succeed to break the law. Though it was completely a contrast from our country yet I couldn't but appreciate it. The picnic participants were very sad but I was happy because this helped me to come to my hotel little earlier.

I came to my hotel, City Club in Manhattan in the evening. It was a very small hotel but charged USD 350/night which was actually too much comparing the facilities. As my meeting places were very close to this hotel I didn't change it. I was very sleepy when I entered the room because of the time difference from my country. I fell into sleep by 7 pm evening US time which was 5 am for my country. 1st Sept morning, I came out of the hotel for breakfast and was moving around the streets to find a suitable restaurant. It was a public holiday in USA, Labor Day, so I didn't have any rush for any appointment. After having the breakfast I tried to find the places where I would go for meeting. I got them very easily as it was not far from my hotel. In the noon when I felt hungry, found a street food shop with a very long queue. I stood for my turn and bought the food at the cost of USD 6 and a water bottle at USD 1. The food was really very tasty but the price was very cheap. Later I learnt that this street food shop, **the halal guys,** run by the immigrant from Egypt, was very popular in Manhattan. There was big news in New York papers for their success. Many other shops tried to copy them but didn't succeed. Riyadh, my

office colleague, who left the job two months back to stay with his wife and son in New York, came to meet me in the afternoon. He brought a mobile SIM card for me, which made me connected with both Bangladesh & USA for every moment. I was really very thankful to him for this. We came out to see Times Square, Jackson Heights, the famous Bengali market and saw a big subway in New York.

2nd Sept was my first meeting day at Perry Ellis. I went there in the morning before 10 am. Ms. Lenka Olivier, Director sourcing, came to receive me at the front desk. She was so courteous and soft behaved that I felt like an older sister was meeting me. I forgot the tension of having a product presentation in front of the team in Perry Ellis. After the meeting we went for shop visits to see the products, way of presentation, prices etc. It was really a useful experience for me. At the end Ms. Lenka assured me of consistent business if we gave consistent price and efficient consumption.

3rd Sept I had another meeting at Weatherproof with Mr. Scott stone, EVP Global Sourcing and Mr. Tony Galvao, EVP Merchandising. They appreciated a lot our collection but were insisting for the very sharp prices. During conversation Mr. Scott Stone talked about New York and I was surprised to know that most of the city buildings, subway and some bridges were built more than 100 years ago. So I didn't dare to compare our city, Dhaka with their one. Immediately I finished the meeting I learnt that the scheduled meeting with V. F. Asia (Nautica) on 4th Sept wouldn't be held for some unavoidable circumstance. So I got a day to spend with my friends. I shared one of my sr. school friends about the free time to see the New York City. Pulok vai, confirmed me to come to my hotel in the evening to take me to some places. He came just in time and then took me to some area in Hillside where majority were Bngladeshi immigrants. I saw Mannan grocery, a big Bangladeshi retail shop and Sagor Restaurant where we had the Samucha & tea. We both were talking a lot and I was enjoying his company very much. He took me to the riverside area from where New Jersey was looking so beautiful. We took many photos there. Finally we had khichuri for dinner in a Bangladeshi restaurant called Alauddin. During the tour I realized that it was a very special day for him but he sacrificed it for a Bangladeshi friend as a gesture towards his country people. It was the 6th birthday of his second son for which I felt little guilty but he didn't let me think that much.

On 4th Sept, I myself moved around little bit in Manhattan. I had to pay also for my carelessness when one boy came forward to carry my bags, as I was not getting a Taxi. He came smilingly with warm greetings to take me to bus station by his Rickshaw. I was actually very happy finding the Rickshaw for small distance toward the bus stop. We were talking happily during the 14 minutes trip but he snatched my smile when he asked USD 70 as 5 USD per minute ride. I saw the fare chart hung there only after I had heard from him. However, he was kind enough to settle down the cost at USD 50 as a win-win approach. I had nothing to say but to exchange a fake smile instead. I started for Maryland, Bathesda in the afternoon from New York. It was a wonderful five hour journey by bus that I passed mostly sleeping. The bus was so big and comfortable with a very clean toilet inside that I felt like I was sitting in the room of the hotel.

I gave a call to Ashik vai, my relative brother when I reached Bathesda, Maryland. He came quickly driving his car to pick me up. We reached his house in half an hour. It was a three storied wonderful brick and wood building. Both Ashik vai & Munni Apa had completed their PhDs in Japan and then came to USA in 2008 with H1 visa and now both are doing very prestigious jobs in Federal Government of USA. They have two wonderful kids, Ashfiha and Ahnaf who are studying in school in sixth and first grade respectively. After reaching the house of Munni Apa I forgot that I had come to a foreign country. It was more like my home country and visiting my sister, brother in law, nephew & niece. Ashik vai drove me to many places like white house, space museum, art gallery, Burlington (port area) along with the full family. I had stayed there for 3 nights and got relief completely of touring abroad before I started for Miami, Florida on 7th Sept. I observed that the people in USA follow traffic rules and parking policy quite religiously. There are lots of parking places in the roads but reserved for different categories, like disabled people, govt. vehicles, fire hydrant etc and nobody will park the vehicle at unauthorized places. The traffic police in USA are very active and honest which make the citizens follow the rules. Otherwise they will be obliged to pay huge fines.

It was almost a three-hour flight from Dulles Airport of Maryland to Miami airport of Florida. When I was landing

the port of Miami it was the end of the day and beginning of evening. It looked so beautiful from the plane that I was only enjoying the moments. My vocabulary is not enough to describe its beauty. It was a domestic flight so I could collect my luggage very quickly and started for my hotel Aloft from the port. It took half an hour to reach the hotel by taxi and took 40 USD as fare. The hotel was really very clean, beautiful & larger than my hotel in New York. The room rate was also very reasonable, 130 USD, which was actually a corporate rate for Perry Ellis, as they booked the hotel for me. That evening I had my dinner with French Fries & Cake from the hotel restaurant, which was the only suitable food for me there.

I felt little tired and went to bed quickly to prepare for the meeting next day, 8th Sept 10 am with Perry Ellis top management in their head office. The office of Perry Ellis was just to the opposite side of Aloft hotel so I reached walking from my hotel. Mr. Anthony Travis, sourcing director, came to the reception to take me to the meeting place. Mr. Neal Seidenberg, Sr. Vice president, came in the room greeting me very warmly. I did my usual presentation in front of them. After the meeting Mr. Anthony introduced me with the Sr. Quality Assurance Manager Mr. Luis Antonio Rivera Franco. He was a cordial gentleman and he showed the warehouse management. It was really a very nice tour with him to see the total warehouse management. He was really kind to introduce me almost everyone he found during the tour. I felt much honored. After the warehouse tour I met Mr. Anthony again who took me to lunch driving his car. After the lunch we started for shop visits where I found our products also. This gave me very proud feelings. I stayed an additional day in Miami for which I had to move alone as I didn't find any close associate there. The city is very big and beautiful. I enjoyed the natural beauty there but for the lack of public transport it was very expensive by taxi to move. I came back to New York on 10th Sept and got the spontaneous life once again.I went to V.F. Asia Nautica office in the morning on 11th Sept to exchange my card, actually to take a chance of meeting them. It did click and found Mr. Brett T. Johnston, Production Manager to regret for the cancellation of the meeting for some emergency reasons. However, we fixed an appointment for the following day with his team.

12th Sept was my last meeting day and it was with Nautica, a brand of V.F. Asia. I reached the office in time where Mr. Brett and Ms. Vicky appreciated the collection and later Mr. Brett showed me their way of presentation of the products. I took some photos of them for my colleagues. After the meeting, Litu vai, Supervisor of Police, NYPD, who is the elder brother of BBSL COO, Pitu vai, took me to show the Statue of Liberty, World Trade center, UN Building, Empire State building etc before the dinner at his home. Vabi, who was the winner of DV lottery, arranged so many dishes for me that it was very difficult to leave their home immediately after the dinner. They have a wonderful talking baby, Ehan. His quite clear accent of Bangla at the age of 3 surprised me. 13th Sept was my last day in New York, the best day of my tour. In the morning, one of my childhood younger brothers came to pick me up. He is Mostafizur Rahaman, a high official of NYPD, the elder brother of Khaled Mohiuddin, talk show presenter of Ind. Television. He took me to his favorite places; first he took me to the bank of Hudson River from where New Jersey was looking so beautiful. Then he took me to a very special place, an artificially made garden, beach and theater stage from an old abandoned railway station. I had lunch at his home and then we met another sr. friend, Lizar vai at his home whom we both saw only after 22 years. It was a very emotional moment for us as we were talking loudly about our childhood and boyhood incidents in front of his wife & kids. It was one of the best moments for me in New York and I thanked Mustafiz for this. My Sadi kaku dropped me to the JFK airport on 14th Sept morning as he had picked me on 31st Aug morning, so he was actually round the trip guardian in my mind. I knew Sadi kaku was there if there was any problem during the trip in USA and remained relaxed to move anywhere with least concerns.

This was the trip when I met the customers, relatives and friends, tried to realize why America was so famous. I got the answer; it was because of the geographic size, people, system, history, culture and off course for its natural beauty.

It was my best trip so far. I will love the repetition of the trip to USA in next five years or more.

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ছবি

(A few snapshots of Babylon Group)

Deed of Agreement signing ceremony between Grameen Fabrics & Fashions Limited and Babylon Products (Softy).

Mr. Victor Howard Rawlinson, Managing Director, David Howard, honoured during his visit of Babylon Garments Ltd.

Famous poet Asad Chowdhury and renowned actress Shirin Bakul are unwrapping the 8th issue of Babylon Kathokata along with Babylon Directors.

Mr. Mohammad Hasan, General Manager, is delivering welcome speech to the learners of Babylon English Language Club-2nd batch.

Prof. Dr. M O K Wahedi is examining a patient at the Free Health Camp organized by Babylon Medical Services.

Babylon team is distributing warm clothes to the workers of Babylon Group.

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি

(A few snapshots of Babylon Group)

High officials from Accord and Alliance along with a number of customer representatives visited Babylon Group & sat a meeting focusing on synchronization of safety requirements.

Scholars are with chief guest Dr. Iftekharuzzaman, Executive Director, (TIB) & Directors of Babylon Group at 4th Scholarship Awarding Ceremony.

Rally on World Environment Day, co-sponsored by Babylon Group.

Babylon donates food, medicine, medical service etc. for the orphan of Families for Children (FFC), an orphan house at Uttara, Dhaka.

A team performance by Babylon's employees & their children at Annual Family Day of Babylon Group.

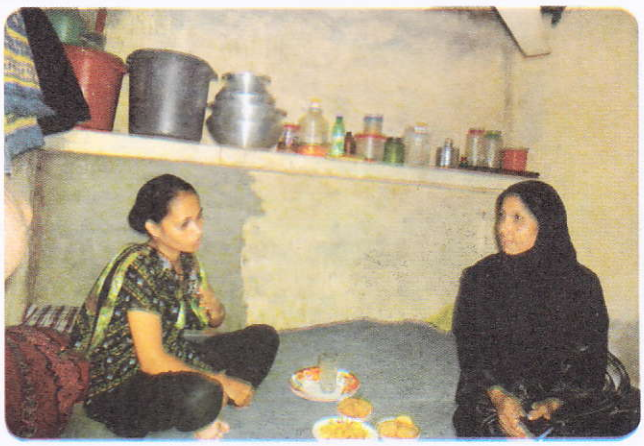

A visit by a welfare officer to see the living condition of Babylon worker to assess the need for help by the management.

BABYLON RESOURCES
Building Future Enterprise
WE
ARE strategically
BETTER
than the best
Babylon Resources Ltd.
Building Future Enterprise
ORACLE
IBM
Our Product Lineup
ERP Solution Solution
Customized Software Solution
Data ware House Solution
Hospital Management
Web Apllication Development
Business Intelligence Suite
CRM Solution
Consultancy
Oracle License Sale & Renew
Oracle Training
Manage Service
Mobile Banking
redhat LINUX
IBM
ORACLE
Sun
ORACLE
BASIS
Bangladesh Association of Software & Information Services

Softy
Sanitary Napkin
Regular Pack (Panty system)
Softy
১০
প্যাড (প্যান্টি সিস্টেম)
রেগুলার প্যাক
Softy
স্যানিটারি ন্যাপকিন
রেগুলার প্যাক (প্যান্টি সিস্টেম)
আপনার সর্বোচ্চ সুরক্ষা আর স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তায় Softy
★ উন্নত মানের জীবাণুমুক্ত পাল্প প্যাডের গভীরে অর্দ্রতা ধরে রাখে, যা আপনাকে সারাদিন রাখবে শুকনো,পরিষ্কার আর সতেজ।
★ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তত।
★ সর্বোপরি এটি আপনাকে দেবে সর্বোচ্চ আরাম আর হালকা অনুভূতি।
গ্রামীণ ব্যাবিলন একটি সামাজিক ব্যবসা। "সফ্‌টি" গ্রামীণ ব্যাবিলনের একটি জনকল্যাণমূখী উদ্যোগ।গ্রামের সাধারণ নারী ও পোশাক শিল্পের নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বল্প মূল্যে সরবরাহের জন্য সফ্‌টি তৈরি করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারক:
গ্রামীণ ব্যাবিলন
গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক
সারাবো, কাশিমপুর, গাজীপুর।
10
Pads (Panty system)
Regular Pack
Softy
Softy
১০
প্যাড
রেগুলার প্যাক
(প্যান্টি সিস্টেম)

ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিষ্ঠানসমূহ:

- ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ
- ব্যাবিলন ড্রেসেস লিঃ
- সুরভী গার্মেন্টস লিঃ
- অবনী ফ্যাশন্স্ লিঃ
- অবনী টেক্সটাইলস লিঃ
- অবনী নীট ওয়্যার লিঃ
- জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিঃ
- ব্যাবিলন ট্রিমস লিঃ
- ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ
- ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ
- ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিঃ
- ব্যাবিলন আউটফিট লিঃ (ট্রেন্ডজ)
- ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিঃ
- ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস
- ব্যাবিলন লজিস্টিক্স লিঃ
- ব্যাবিলন মেরিন ভেনচারস্
- ব্যাবিলন এগ্রিসাইন্স লিঃ
- নিউজেন টেকনোলজি লিঃ
- ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিঃ
- গ্রামীণ ব্যাবিলন প্রোডাক্টস্

Head Office:

2-B/1 Darus Salam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel : 9023495-6, 9023462-3 (Off)
9007175, 9010533, 8011089 (Fac)
Fax : 880-2-8032949
E-mail : babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com